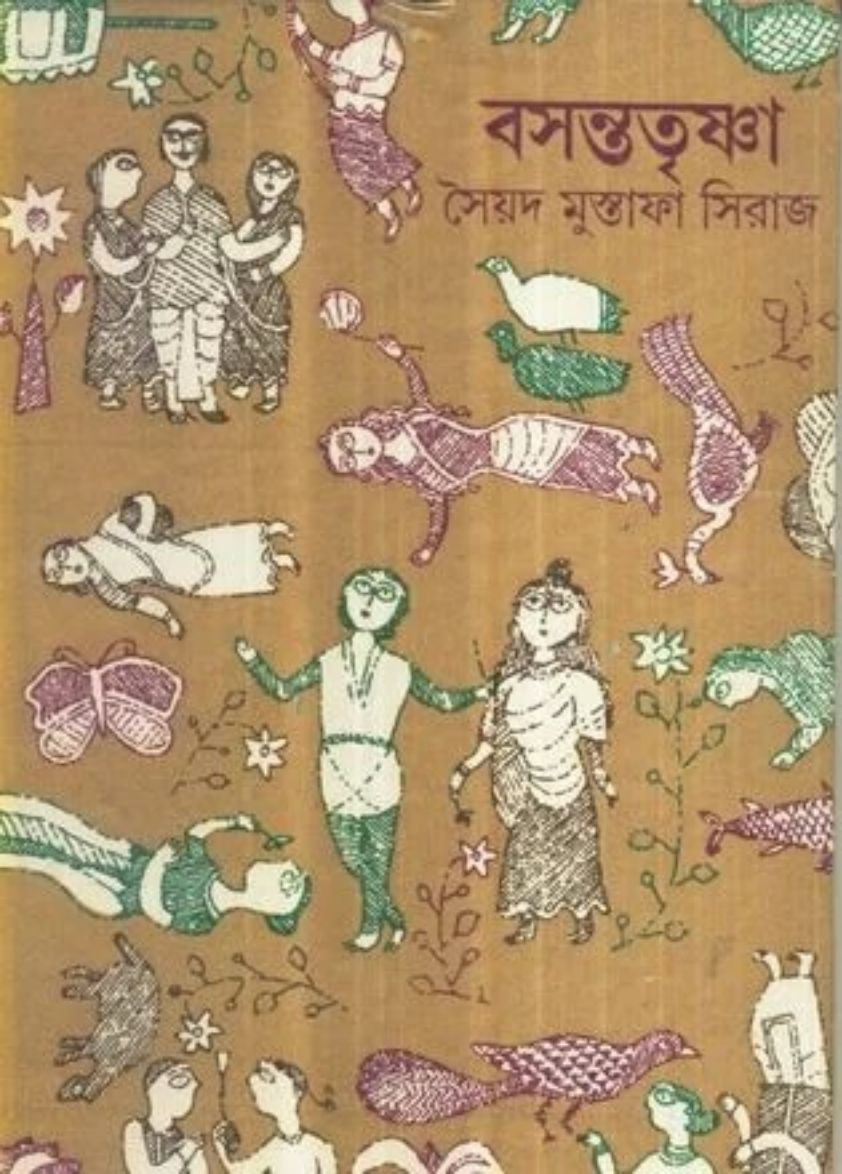


বসন্ত তৃষণ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



বসন্তুতৃষণ

☀ বেন্দা এবং দুই আইন রক্ষক

বেন্দা গ্রামের ছপুরে নদীর ধারে একটা গাছের ডালে চিত হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। সেই সময় বাঁশবনের ভেতর থেকে চাপা গলায় কথা বলতে বলতে দুজন আইনরক্ষক গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

প্রথম আইনরক্ষকের নাম জগদীশ। সে বলল, অনেক হাঁটা হল। এবার একটু বস। যাক উপেন্দ্র।

দ্বিতীয় আইনরক্ষক উপেন্দ্র নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে বলল, উরে ঘাস! কী রোদ্দুর! এতক্ষণ কিছু বুঝতে পারিনি।

জগদীশ হাতাটাকা নগ্ন মাটিতে বসে পড়ল। বেটন দিয়ে উর্বর খুসার মাটির ওপর দাগ কাটিতে কাটিতে বলল, পারবে কেন? কেমন ঠাণ্ডা! আমাদের কাছে কাটিয়ে এলে। আমি শালা চুলপাকা বুড়ো।

সে হাসতে লাগল। উপেন্দ্র বসল না। ঢোলা হাফ পেণ্টুলের পকেট থেকে সন্দের রঙের শাল বের করে মুখে ঢাকল। বাঁকা হেসে বলল, ব্যাটা মেয়েটাকে কীভাবে কোথেকে জগদীশ এনেছে। বুঝল জগদীশ?

কেন, কেন? জগদীশের চোখ নাচতে থাকল।

উপেন্দ্র বলল, তুমি তো নতুন লোক। আমার খেঁচা হয়ে গেছে কাঁড়িতে। বাঁকারামকে আমি কম চিনি? শাল একের নম্বরে চ্যামনা। ওর আগের বউটাকে দেখেছি। এটাকিও দেখলুম। বিয়ের মাগ বলে মনেই হয় না।

জগদীশ নিঃশ্বাস কেলে বলল, সুন্দর-সুন্দর মেয়েগুলো মাইরি, সবখানে দেখেছি, শেষ পর্যন্ত যত—(অবলা শব্দ)—এর পাল্লায়

গিয়ে পড়ে। যাক গে। সিগারেট দাও। বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

উপেন্দ্র খাকি শার্টের বুকপকেট থেকে চার্মিনারের প্যাকেট বের করে বলল, সিগারেটও শেষ। এমন বেহুদা এরিয়া, একটা দোকান পর্যন্ত নেই। এই দেখ, মোটে একটা মাল। ছিঁড়ি?

না। তুমি বামুনের ছেলে। প্রসাদ দিও। বলল জগদীশ আড়া-মোড়া দিল। তারপর অকারণ কাঁচাপাকা গৌফ পাকাতে থাকল। ছায়াঢাকা নদীতীরে ফুরফুরে হাওয়া এবং পাখির ডাকে প্রোঢ় আইন-রক্ষকের মনে আরাম জেগেছে।

উপেন্দ্র হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাল। দেশলাই কাঠিটা একটু তকাতে শুকনো পাতার ওপর ইচ্ছা করেই ফেলে দিল। সামনে নদীর পাড়ে ঘন ব্যানাবন। শুকিয়ে খড় হয়ে আছে। তাই উপেন্দ্র আগুনটা বাড়তে দিল না। বুটে ঘষে নেভাল। তারপর বলল, এবার জলতেষ্টা পেল।

জগদীশ হাসল। —কেমন খ্যাটটা দিয়ে এলে—মুর্গির ঝোলে কন্ঠুই ডুবিয়ে।

উপেন্দ্র চোঁ চোঁ করে সিগারেটে আরও ছোটো টান দ্রোজগদীশ শকে দিল। বলল, নদীও মাইরি শুকনো। জল পাই কোথায়? এলো তো?

চৌকিদারের বাড়ি যাও ফের। জগদীশ চোখ বুজে ধূমপান গিলতে গিলতে বলল।

উপেন্দ্র রাগ করে বলল, বাঁকার বাড়ি? ওই মাগীর হাতে জল খাবি?

জগদীশ শিকখিক করে হেসে বলল, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে উপেন্দ্র।

তুমি—জগদীশ মাইরি, যত বুড়ো হচ্ছে, তত—

সে হঠাৎ থেমে গেল। কানের ওপর থেকে কী ছলাৎ করে পড়ে কাঁধের খানিকটা শাণ করে ফেলেছে। দ্রুত কয়েক পা সরে সে রাগী দৃষ্টিতে মুখ তুলে গাধে দিকে তাকাল। ডালপালার আড়াল থেকে কোন পাখি কুকর্ম কচ্ছে।

এবং তাকিয়েই সে ন্দোকে দেখতে পেল। বেল্লা ফুট আষ্টেক উচুতে

দাবি করবে। কিন্তু জনপ্রাণীটি নেই। এপারটা গাছপালা ও ঝোপ-
শাখার মতলব ছিল, নিঃশব্দেই গ্রামে, যেখানে তার কাল সন্ধ্যায়
গা ঢাকা দেবে। এই আকস্মিকতা সে অনুমান করতে পারেনি। আইন-
রক্ষকটিকে নিষ্পলক দৃষ্টি তার দিকে দেখামাত্র সে ভয়ে কাঠ হয়ে
গেল।

জগদীশ বলল, এ হে হে! সর্বনাশ করেছে! ওবেলা বড়বাবু
কাঁড়িতে আসবেন ইন্সপেকশানে। উপেন্দ্র তার আগে ধুয়ে রেখো।
বড়বাবু বড় খুঁতখুঁতে লোক কিন্তু। জুতোর ডগায় একচিলিতে
ময়লা থাকলে বাপ তুলে গাল দেয়।

উপেন্দ্র গর্জন করে বলল, তুই কোন শালা রে?

জগদীশ এবার টের পেলে গাছের ওপর একটা কিছু ঘটেছে। সে
মুখ তুলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, কী কাণ্ড! এ যে মাইরি
দিনহপুরে গেছোছুত। এই ব্যাটা! নেমে আয়!

বেন্দা কাঠ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কাল থেকে
গ্রাম ছেড়ে মাঠঘাট বনবাদাড়ে ঘুরে, এবং খাওয়াদাওয়াও বিশেষ হয়নি,
সে খুবই ক্লান্ত। নৈলে ধূপ করে পড়ে দৌড় দিত। সে ভীষণ
দৌড়বান। তাছাড়া সে এখানকারই মানুষ। এ মাটির প্রতি ইচ্ছা
তার মুখস্থ। বনজঙ্গল আর জলার দেশে লুকিয়ে পড়ার জায়গা অভাব।
অন্তত কোনোরকমে কাশবনের মধ্যে ঢুকতে পারলে তাকে আর খুঁজে
বের করা আইনরক্ষকদের অসম্ভব হয়ে উঠত।

উপেন্দ্র বেটন তুলে বলল, নাম শালা এখুনি। নৈলে গিঁট খুলে
দেব।

জগদীশ ক্রুর হেসে বলল, মনে হচ্ছে কোন পুরনো পাত্রী। এ্যাই!
তোর নাম মুজ্জফর?

এবার বেন্দা উঠে বসল। করুণ মুখে বলল, আজ্ঞে না সেপাইজী!
আমি মুজ্জফর নই, আমি বেন্দা।

আইনরক্ষকদ্বয় মুখ তাকাতাকি করল। তারপর উপেন্দ্র বেটন

জগদীশ বেটন ছুড়ে মারল। বেন্দা মুখ সরিয়ে নিল। বেটনটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওপরের ডালে ঠোঁকর খেয়ে সশব্দে নিচে এসে পড়ল। উপেন্দ্রও তার বেটন ছুড়ল। বেন্দা সেটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর কাকুতিমিনতি করতে লাগল। —আমি বেন্দা, মা কালীর দিবি হুজুর! আমি বিলবাড়ির বেন্দা—বিশ্বাস করুন। আমি চোর নই—চোঁটা নই—আমি বেন্দা।

সে আতঙ্কে প্রজাপ বকতে থাকল। ভুলে গেল যে আইনরক্ষকের বেটন তার হাতে। উপেন্দ্র গাছতলায় ব্যস্তভাবে ঢিল খুঁজছিল। তার বেটন গিয়ে লাগল বেন্দার কোমরের হাড়ে। বাপরে বলে আর্তনাদ করে বেন্দা সে-বেটনটাও ধরে ফেলল। তারপর আঁকুপাঁকু করে ওপরের ডালে উঠতে থাকল। ভয়ে বেটনদুটো সে ফেলতে পারছিল না, পাছে আবার আইনরক্ষকরা তাকে টিট করে।

ওপরে মগডালে উঠতে উঠতে কতকগুলো ঢিল তার গায়ে লাগল। কিন্তু নদীর ধারের মাটিটা তত শক্ত নয়। জমানো ভুধের মতো মাটির ঢিল তার গায়ে লেগে গুঁড়ো হয়ে বার পড়ছিল। জগদীশ ও উপেন্দ্র রাগে এবং অপমানে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। কিছুতেই গাছ থেকে নামানো যাচ্ছে না যখন, তখন স্বভাবত মাথায় আসা উচিত, ট্রেনিংয়ের সময় আসামী ধরার বিস্তর কলাকৌশল শেখানো হয়েছিল বটে, কিন্তু আসামী গাছে চড়লে তাকে নামানোর ফিকির কি শেখানো হয়েছিল—বিশেষ করে এমন অথচো পাণ্ডববর্জিত স্থান দ্বারকা নদীর অববাহিকায়, যেখানে মাটির চাঙড় ছুড়ে মারা মানে শ্যালিকাদের তামাসা জামাইবাবুকে?

মগডালের ঘনপাতার আড়ালে বেন্দা গিরগিটির মতো লেপ্টে রয়েছে। এই গাছগুলো প্রায় তিরিশফুটপর্যন্ত উঁচু হয়। অসহায়, ক্লান্ত, লুক্ক, অপমানিত এবং প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ আইনরক্ষকদ্বয় এপাশে-ওপাশে মানুষ খুঁজছিল—যাকে বা যাদের ডেকে আইনসম্মত আবশ্যিক সাহায্য

দাবি করবে। কিন্তু জনপ্রাণীটি নেই। এপারটা গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা—তার ওধারে একটা গ্রাম, যেখানে তারা কাল সন্ধ্যায় রোঁদে গিয়েছিল এবং এক দাগী আসামী পাকড়ানোরও হুকুম থাকায় ছপূর অন্ধি ডিউটিকাল সম্প্রসারিত করার অজুহাত মিলেছে। এখন তাদের কাঁড়িতে ফেরার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু গাছের ওপর নিশ্চয়ই এ ব্যাটা এক আসামী, অতএব একে পাকড়াও করে নিয়ে গেলে মুখরক্ষা হয়।

নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ বিলাসল। তারপর ধু ধু মাঠ ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে দিগন্তের গ্রামে শেষ হয়েছে। ধাঁদিকে—পশ্চিমে মাইলটাক দূরে নদী পেরিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। সাদা রঙের ব্রিজ গ্রীষ্মের রোদে ধু ধু জ্বলছে। দেখতেই ভয় করে সেই রোদকে। বলকে বলকে আগুনের হুকা ছড়াচ্ছে দূরে। তরতর করে কাঁপছে কী ঝিলমিলে ঢেউ আদিগন্ত। লু হাওয়া বইছে হু-হু করে। কিন্তু এখানে নদীতীরে মাটি ও গাছপালার গুণে তাপের হলকাটা টের পাওয়া যায় না। বরং আরামে ঘুমই এসে যায় গাছতলায় বসে থাকলে।

কোথাও লোক নেই। জগদীশ ও উপেন্দ্রর রাগ কিছুক্ষণ পরে হাসিতে রূপান্তরিত হল। দুজনে হা-হা হো-হো করে হাসতে লাগল। অসংখ্য আসামী ধরার অভিজ্ঞতা তাদের আছে। কিন্তু এমন বিদ্যুটে অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। দুজনে হাত বেড়ে খুলো সাফ করে হাসতে-হাসতে এবং হাঁফাতে-হাঁফাতে একত্র হল। জগদীশ বলল, গুয়ের বাচ্চা মানুষ, না ভূত মাইরি !

উপেন্দ্র বলল, শালার বাপ নামবে ! ওয়েট।

দুজনে মুখ তুলে বেন্দাকে দেখতে লাগল। একহাতে বেটনছটো ধরে রেখেছে, অস্ত্রহাতে ডাল। ছ'পা খাড়া আরেকটা ডালে বেড় দিয়ে রেখেছে। লোকটার গাছে চড়ার ক্ষমতা অসামান্য বলতে হয়। নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকে এ অভ্যাস তার আছে। তার চেয়ে অল্পত ঘটনা, গাছে চড়ে যে ঘুমোয়, সে কি মানুষ, না ইমুমান ?

জগদীশ বলল, শালা বাঁদর !

ধূত উপেন্দ্র ডেকে বলল, এ্যাই ব্যাটা বেন্দা না ফেন্দা ! লাঠিছুটো ফেলে দেদিকি লক্ষ্মীছেলের মতো। আমরা চলে যাচ্ছি। কই, ফেলে দে।

বেন্দা বলল, দিলে আবার মারবেন ছজুর।

জগদীশ বলল, না রে বাবা না ! তোর সঙ্গে ফকুরি করলুম খানিক। কই, দে ! চলে যাই !

বেন্দা কান্নাভরা গলায় বলল, আমি চোর নই। চোরের ভাইও নই। খামোকা মারলেন।

উপেন্দ্র বলল, না-না বাবা। আর মারব না। দেদিকি লাঠি ছুটো।

বেন্দার লাঠি ছুটো ফেলে দেবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তখন জগদীশ বলল, উপেন্দ্র ! সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। গাছে ওঠ। শালার কান ধরে নামাও। তারপর যা করার আমি করছি।

ট্রেনিংয়ে গাছে চড়া শেখানো হয়েছিল বৈকি। তাছাড়া উপেন্দ্র ছেলেবেলায় খেলাধুলো, সীতার, মারামারিতে যেমন—তেমনি গাছে চড়াতেও দক্ষ ছিল। তারপর কবে সেই ট্রেনিংয়ের সময় গাছে চড়েছে, তারপর এতকাল আর চড়ার দরকার হয়নি। বুটজুতো পরে গাছে চড়ার অসুবিধেও কম নয়। অগত্যা সে জুতো-মোজা খুলল। তারপর বেন্দার উদ্দেশ্যে গর্জন করে বলল, থাম শালা পুঞ্জির ভাই। যাচ্ছি !

আইনরক্ষককে গাছে চড়তে দেখে বেন্দার মুখ শুকিয়ে গেল। এই প্রকাণ্ড গাছটায় চড়া সহজ কর্ম নয়। বসন্তে গাছটা খোলস ছেড়েছে। গুঁড়ি এবং ডাল খুব পিচ্ছিল। মসৃণ, হু-ধেআলতা রঙ। মাটি থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচু পর্যন্ত কোনো ডাল নেই। চড়তে হলে একটু তফাতে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ডালটা আঁকড়ে কসরত দেখাতে হবে সার্কাসের খেলার মতো। আশার কথা, বোকা আইনরক্ষকটি গুঁড়িতে ওঠারই চেষ্টা করছে। অশ্রুজন তাকে ঠেলে ধরে আছে।

চেষ্টা করেও ওপরের ডাল আঁকড়ানো গেল না। তখন দুজনে ভারি অবাক হয়ে গেল। জগদীশ বলল, ব্যাটা চড়ল কী ভাবে ? মইটই আছে নাকি ওপরে তোলা !

উপেন্দ্র বলল, কই মই ? নেই তো !

জগদীশ বলল, হুঁ। তাহলে শালার মাগ মই এনে গাছে তুলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এ সেই মুজফর না হয়ে যায় না। উপেন্দ্র, গিয়ে বাঁকা চৌকিদারকে ডেকে আনো। আরও লোকজন আর একটা ভাল দেখে মই নিয়ে এস। আমি দেখি শালাকে।

উপেন্দ্র অনিচ্ছায় পা বাড়িয়ে বলল, কেলংকারি ! তারপর টের পেলে, তার পায়ে জুতো নেই। তাই মোজা ও জুতো পরতে ব্যস্ত হল।

ঠিক তখনই মাথার ওপর খড় খড় ফট ফট শব্দ হতে থাকল এবং বেটন ছটো ছধারে ছিটকে এসে পড়ল। জগদীশ লাফ দিয়ে এগিয়ে আইনদণ্ড ছুটি কুড়িয়ে আনল। খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, ব্যাটাচ্ছেলের বুদ্ধি এতক্ষণে খুলেছে। থাম্ একুনি ব্যবস্থা হচ্ছে।

বেন্দা ওপর থেকে করুণ করে বলল, আমি চোর নই হুজুর। আমি বিলবাড়ীর বেন্দা। বাঁকাদাকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কে।

উপেন্দ্র জুতোর কিতে বাঁধতে বাঁধতে অল্লীল গাল দিয়ে বলল, তুই আমার—এর বাপ। তোকে এই গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে না পেঁদাই তো কী বলেছি।

জগদীশ আপসের সুরে বলল, ঝাখ্ বাবা মুজফর ! আর খামোকা ঝামেলা বাড়াস নে। আমি কথা দিচ্ছি, তোকে এ্যারেষ্ট করব না। শুধু মুখোমুখি ছটো কথা বলে ছেড়ে দেব। লক্ষ্মী বাবা আমার ! নেমে এসো দিকি।

বেন্দা বলল, না হুজুর। আপনারা রেগে আছেন। খুব মারবেন। আজ ছদিন পেটপুরে কিছু খাইনি। মারলে আমি মরে যাব, বাবা গো !

সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। জগদীশ ও উপেন্দ্র হেসে ফেলল। দাগী আসামীদের বিস্তর ছলাকলা তাদের পরিচিত। মুজফর নামে ফেরারী দাগী অবশ্য খুনে ডাকাত। খুনে ডাকাতদের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তারা কান্নাকাটি করে না, এমন নয়। রতনপুরের রহমত ছিল সেসব ম্যানিয়াক। কমবয়সী মেয়েদের রেপ

করে মেরে ফেলত। জগদীশ তাকে পাঁচবারের বার ধরেছিল। রহমতের সে-কী কান্না !....মেয়েটা আমার পেটের মেয়ের মতো। হায় সেপাইজী ! এ-কাজ আমি কোন মুখে করব ? জগদীশ বলেছিল, খুস্ শালা ! তুই কী মাগী যে তোর পেট থেকে বিইয়েছিলি ? বিচারে রহমতের কাঁসীর হুকুম হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্টে আপিল করে খালাস পায় বেকসুর ! রহমত পরে খুন হয়ে যায় আততায়ীর হাতে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে দুষ্টির শাস্তি কোনো-না-কোনে, ভাবে হয়। জগদীশ মানে একথা।

উপেন্দ্র বলল, চললুম জগাইদা ! শালা যেন পালায় না।

বেন্দা আর্তনাদ করে বলল, নামছি হুজুর। এখুনি নামছি ! তারপর সে ডালবেয়ে তরতর করে নামতে থাকল।

জগদীশ ও উপেন্দ্র অবাক হয়ে তার নামা দেখতে থাকল। গুঁড়ির মাথায় এসে সে ছড়ানো সমান্তরাল ডালের ওপর দিকে যেই এগিয়েছে, হুই আইনরক্ষক চৌকিয়ে উঠল, শালা পালাচ্ছে ! পালাচ্ছে !

বেন্দা কাতরস্বরে বলল, পালাইনি হুজুর। অতটা উচু থেকে এখন লাফ দিয়ে নামলে মরে যাব। দুদিন খাওয়া নেই কিনা। আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি নামছি।

তবু হুজনে ডালটার তলায় ওকে অনুসরণ করল। ডালটা শেষ-দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে সেখানে কাশ এবং নাঠাকাঁটার ঝোপ। জগদীশ ও উপেন্দ্র বুঝতে পারল, এখান দিয়েই গাছে চড়েছিল ব্যাটা। কাঁটা বাঁচিয়ে পা হুটোকে বেন্দা ঝুলিয়ে দিতেই তাকে ওরা শূন্য থেকে ধরে নিল।

বেন্দাকে মাটিতে নামিয়ে হুজনে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। গাছের ওপর এই আসামীকে যতটা বয়স্ক দেখাচ্ছিল, ততটা নয়। বয়সে উপেন্দ্রর চেয়ে অনেক ছোট। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, খালি গা, কোমরে কোনোমতে পেঁচানো ময়লা একটা ধুতি। চেহারা থেকে সৌখিনতার ছাপ মুছে যায়নি এখনও। কোটরগত টানা-টানা চোখ। ভেজা গাল। সরু একচিলতে গৌরব আছে।

গায়ের রঙ পোড় খাওয়া, তামাটে। জন্মের সময় হয়তো ফর্সাই ছিল কিছুটা।

হুই আইনরক্ষক একসঙ্গে ফৌস করে খাস ছাড়ল। অমনি বেন্দা করজোড়ে বলে উঠল, আমাকে মারবেন না হুজুর। মারলে আমি মরে যাব।

প্রথমে জগদীশ তার চুল খামচে ধরে পিঠে ফটাস করে বেটনের বাড়ি মারল। তারপর উপেন্দ্র তার পাঁজরে গুঁতিয়ে বলল, শালা পুন্ডির ভাই!

বেন্দা বাপরে বলে পড়ে গেল শুকনো ঘাসের ওপর। জগদীশের হাতে কয়েকটা চুল রয়ে গেল। সে বেন্দাকে ফের চুল ধরে টানতে টানতে গাছের গুঁড়ির কাছে নিয়ে চলল। উপেন্দ্র থেমে নেই। হাঁটুর পাশে, কনুইয়ে, কখনও বাহু ও পিঠে ক্রমাগত বাড়ি মারছিল। বেন্দার আর্তনাদে জনহীন নিঃশব্দ নদীতীরের প্রকৃতি কাঁপতে লাগল। গাছের গোড়ায় নগ্ন মাটিতে তার চুল ছেড়ে দিল জগদীশ। তারপর হাঁটু হুমড়ে ধরাশায়ী বেন্দার দিকে তাকিয়ে জুর হেসে বলল, কী রে শালা মামদো? কেমন লাগছে এখন?

উপেন্দ্র তার জোড় করা হাতে বেটন মেরে বলল, খুব ভুগিয়েছে শালা! খুব ভুগিয়েছে তখন থেকে! নাও—নাও! এই নাও! এ্যাই! এ্যাই! এ্যাই!

বেন্দা শরবিক জন্তুর মত গোঙাচ্ছিল। জগদীশ ইশারায় উপেন্দ্রকে ধামতে বলল। তারপর ফের বেন্দার চুল টেনে বলল, নাম কী? এ্যা?

বেন্দা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আমি বিনোদ হুজুর। আমি বিলবাড়ীর বিনোদ।

তবে যে বেন্দা-বেন্দা করছিলি?

হুজুর, সবাই আমাকে বেন্দা বলে ডাকে।

উপেন্দ্র পাশে বসল। বলল, হ্যাঁ রে শালা! গাছে চড়েছিলি কেন?

বেন্দার ছহাতের আঙ্গুল কেটে রক্তের ছোপ পড়েছে। চোখ মুহুঁতে-
গালে রক্ত মেখে গেল। সে বলল, যুমোচ্ছিলুম হজুর। কাল সারা-
রাত শোয়ার জায়গা পাইনি। তাই বড্ড যুম পেয়েছিল।

জগদীশ হাসতে হাসতে বলল, এখনও চালাকি? গাছে যুমুড়ে
উঠেছিলি?

অভ্যাস আছে। ছোটবেলায় যখন বাবুদের বাড়ী রাখালী
করতুম, এখানে গরুগুলো চরতে দিয়ে এই গাছটায় চড়ে যুমোতুম।

গাছে যুম হয় মানুষের? জগদীশ বেটন তুলল।

বেন্দা ব্যস্ত হয়ে বলল, হয় হজুর। আমার হয়।

উপেন্দ্র বলল, তোর বাড়ী নেই যে গাছে যুমোতে এসেছিলি?

সে ছুঁথের কথা কী বলব হজুর! বেন্দা হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,
ছোটবেলা থেকে আমার বাবা-মাকে দেখিনি। মাসির হাতে মানুষ।
মাসির ওপর রাগ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

জগদীশ ধূর্ত ভঙ্গিতে হাসল।...রাগ করে! পালিয়ে বেড়াচ্ছিস!
এ শালা মহা ধড়িবাঁজ দেখছি!

বিশ্বাস করুন! মাসির ওপর আমার ঘেন্না হয়েছে খুব। বেন্দা
ফের হাত জোড় করেছে। কিন্তু এবার আর বেটন পড়ল না। সে
ধরা গলায় বলতে থাকল। মাসি আমার সামনে থেকে কাল ছপুর্নে
ভাতের থালা কেড়ে নিলে। কতরকম খোঁটা দিলে। আমি খোয়া-
হাত মুহুঁতে মুহুঁতে পালিয়ে এলাম।

উপেন্দ্র বলল, রাতে কোথায় ছিলি?

বেন্দা আস্তে আস্তে উঠে বসল। আঙ্গুল তুলে নদীর ওপারে
কোণাকুণি একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, প্রথমে ওখানে গেলুম হজুর
ওই যে কুঁড়ে ঘরখানা দেখছেন—যুধিষ্ঠিরের কুঁড়ে। লোকটা ওখানে
চাষবাস করে। ছমুঠো খেতে অবশি দিলে। কিন্তু থাকতে দিলে
না। বললে, এখানে জায়গা হবে না বাপু।

জগদীশ বলল। তুই চোর বলে দিলে না!

না হজুর। ওর কুঁড়েটা খুব ছোট। হজনের জায়গা হয় না।
আর...

বেন্দা ওই অবস্থাতেই একটু লাজুক হাসল। জগদীশ বলল, আর
কী রে শালা?

শালা শুনে বেন্দা বুঝল, ওর কথা এরা বিশ্বাস করছে না। তবু,
মরীয়া হয়ে বলল, আর হজুর—গাঁয়ের লোকে জানে—চৌকিদারদাকে
জিগ্যেস করবেন, যুধিষ্ঠিরের কাছে কে শুতে যায়।

খিকখিক করে দুই আইনরক্ষক হাসতে থাকল। তারপর জগদীশ
বলল, হঁ। কে শুতে যায়?

আজ্ঞে, হরিমতী।

সে কে?

ওই যে বাবুর বাগানে থাকে। হরিমতী বোষ্টুমী। সেজ্ঞেই তো
বাবু যুধিষ্ঠিরের একখানা জমি কেড়ে নিয়েছে।

উপেন্দ্র বলল, এ পুঞ্জির পুত্র মহাভারত খুলে বসল দেখছি। এ্যাই!
বল, কেন এমন করে পাগিয়ে বেড়াচ্ছিস?

সত্যি বলছি হজুর। মাকালীর দিব্যি। মাসির ওপর রাগ করে।

আবার বেটনের গুঁতো খেয়ে সে থেমে গেল। জগদীশ বলল,
উহ! দেখেই বুঝেছিলুম এ এক অভল জলের মাছ। ওঠ শালা!
কাঁড়িতে চল। তারপর আসল কথা কীভাবে বেরিয়ে আসে, দেখা
যাবে। ওঠ্।

উপেন্দ্র তার বাহু ধরে ফের গুঁতো মেরে টেনে ওঠাল। তারপর
ঘড়ি দেখে বলল, উরে কবাস! দুটো বেজে গেছে। চলো জগাইদা!
চৌকিদারকে পেলে ভাল হত। কিন্তু আর গায়ে যাওয়ার সময় নেই।

জগদীশ বেন্দারই ধুতির এক অংশে বেন্দাকে পিঠমোড়া করে
বাঁধল। তারপর চুল ধরে টেনে বলল, চল শালা!

বেন্দা আকাশ ফাটা আর্তনাদ করে উঠল। মিথ্যেমিথ্যি আমাদের
মারখোর করছেন হজুর! আমি চোর নই। আপনাদের পায়ে
পড়ছি, আমাদের থানায় নিয়ে যাবেন না।

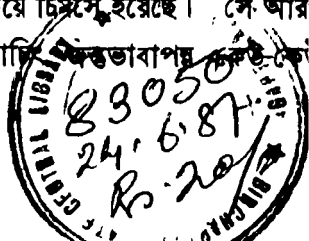
উপেন্দ্র তার পেছনে বেটনের গুতো ও বাড়ি মারতে থাকল। নির্জন নদীতীরে একটা উপদ্রব বটে। এখানে ছায়া আছে। পাখিরা আছে। শান্তি আছে। বিশ্বামের আরাম আছে। সব তখনই হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো ভারি সন্দেহজনক। একজন এমন চোর-চোদ্দা চেহারার লোক গাহে চড়ে ঘুমোচ্ছিল। তাছাড়া আইন-রক্ষকদের কথায় গাছ থেকে সে নেমে আসেনি। উপরন্তু বেটনছটো আটকে রেখেছিল। অপরাধের সংখ্যা ক'ন নয়।

তার ওপর অসংলগ্ন কথাবার্তা। অথচ পাগল নয়। আগে জগদীশ, মধ্যে বন্দী বেন্দা এবং পেছনে উপেন্দ্র। মাঝে মাঝে সে বেটন ঢালাচ্ছে এবং আসামী এত বিদ্যুটে টেঁচাচ্ছে যে মেজাজ আরও চড়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে ছায়া ঢাকা নিচু বাঁধের পথ ধরে এই সংক্ষিপ্ত মিছিল এগিয়ে চলল দূরের ত্রিভের দিকে।...

বাবু এবং হরিমতী

পরনে নীল লুঙি, গায়ে হাফহাতা সাদা পানজাবি, আঙ্গুলে সিগারেট এবং মুখে পান—কমলাক্ষ রাস্তা থেকে চড়াগলায় ডাকছিলেন, বোষ্টুমী, আছিস নাকি? ও বোষ্টুমী!

হরিমতী দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে মুসুরের কুটো বাছছিল। তার বয়স অনুমান করা কঠিন। একসময় হালকা ছিপছিপে গড়নের এই মেয়েটি রূপে ফেটে না পড়লেও অনেকের নজর কাড়িতে পারত। তখন ওর জীবনের সুদিন ছিল। অর্থাৎ খাওয়াদাওয়াটা নিশ্চিন্তে জুটত। তখন ওকে প্রেম দিতে আপামর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতাও ছিল। খাওয়াদাওয়া জুটলে শরীরটা চেকনাই থাকে। খাওয়া-দাওয়ার টানাটানিতে শরীর শুকিয়ে চিরসুঁহরয়েছে। সে আরও পাঁচটা গ্রাম্য মেয়ের মতো মেয়ে। কদাচিৎ কলকাতা থেকে তার দিকে লোভী চোখে তাকায়।



কমলাক্ষের ডাক শুনে হরিমতী চমকে উঠেছিল। ক'দিন থেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, যায় নি। এবার বুঝি কুরুক্ষেত্র বাধাতে নিজেই হজির। কাঠা পাঁচেক জায়গা ঘিরে ইটের নিচু পাঁচিল ভেঙেচুরে আছে। যেখানে দরজা, সেখানে তালপাতার আগড় বাঁশের বাতায় আঁটোশাঁটো। আগড় ঠেলে কমলাক্ষ ঢুকলে দেখা গেল পায়ে জুতো নেই। হরিমতী মুখ নিচু করে পা ছটো দেখছিল।

একেবারে গাঁয়ের শেষে নদীর উঁচু পাড়ে ফুলফলের বাগানের কেন্দ্রে মাটির ঘর। একসময় ফুল ফল বেচে হরিমতীর বা তার মরে যাওয়া স্বামীর অন্ন জুটত, যে ছিল এই বাবুর বাগানের মালী। এখন ফুলফলের গাছ ছন্নছাড়া। চোরচোঁটা, লম্পট এবং ছুষ্টু ছেলেপুলেদের দৌরায়ে বাগান বিধ্বস্ত। আর হরিমতীও তত খাটিয়ে মেয়ে নয়। জলসেচ, নিড়েন, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি যেসব পরিচর্যা দরকার, তাতে বরাবর তার আলস্য ছিল। যখন সে বাড়ি থাকত না, ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে গরু ছাগল ঢুকে মুড়িয়ে খেত। তাছাড়া তার ওপর রাগ করে রাতবিরেতে কারা গোড়ায় কোপ মেরে বা উপড়ে অসংখ্য ফুল গাছ মেরে ফেলেছে।

গোবিন্দমালী ছিল ওড়িয়ার লোক। হরিমতীর বাপের বাড়ি এই গ্রামেই। গোবিন্দের আমল গেলেও হরিমতী বাবুপরিবারের কুপা পেয়েছিল। তার বিবিধ কারণ থাকতে পারে। এমনকি বিধবা হরিমতী কিংকর বোরগীকে নিয়ে বাস করছিল, তাতেও বাধা আসেনি। বোরগী খোল বাজিয়ে লক্ষবাক্ষ করে খুব কেন্দন গাইত। মাঝে মাঝে মাধুকরী করতেও বেরুত। শেষদিকে পান আর বিস্কুট বেচে বেড়াত। বানের জলে ডুবে বোরগী মারা পড়েছিল। তারপর হরিমতীর অন্নকষ্ট সমানে চলেছে। শুধু বোঁঠুমী পদবীটা টিকে আছে। যা একান্তই কিংকরের স্মৃতিদৃষ্ট। কখনও হরিমতী বোঁঠুমী শুনলে বেজায় চটে যায়। কখনও মিষ্টি হেসে মেনে নেয়।

কমলাক্ষ উঠানে দাঁড়িয়ে পানখাওয়া মুখে হাসলে হরিমতীর যেন

‘স্বাম দিয়ে অর ছাড়ল। আস্তে বলল, এবেলা যাব-যাব ভাবছিলুম গো, বুঝলেন? এবেলাই যেতুম।

কমলাক্ষ বললেন, গিয়ে আমাকে উদ্ধার করতিস। তোর নিজের ভালর জগ্গেই ডেকেছিলুম। ও কী ঘাঁটছিস?

হরিমতী সলজ্জ হাসল। মুসুরী গো! খান্নুর বউয়ের কোলেরটা দুধতুলুনীতে ভুগছিল। মায়ের কাছে একটা গাছ পেয়েছিলুম। মনে ছিল গাছটা। মধু দিয়ে বেঁটে চটকে আধুল চোষালে দুধতোলা সারে।

সারল বুঝি?

হঁউ। হরিমতী কুলো রেখে উঠল। চালের বাতা থেকে চাটাই পেড়ে বলল, বসুন বাবু। ছুখিনীর ঘরে পায়ের ধুলো দিলেন যখন, বসুন ছুঁদণ্ড।

কমলাক্ষ বসলেন না। বললেন, মুসুরী ভাঙবি কোথা রে? চাকি আছে ঘরে?

হরিমতী মাথা নাড়ল। সেদ্ধ করে খাব এবেলা। চাকি কী হবে? বলিস্ কী! মুসুরীসেদ্ধ খাবি কেন?

হরিমতী হাত বাড়িয়ে বলল, পয়সা দিন না তবে। চাল কিনে ভাত খাই।

সে হাসছিল। কমলাক্ষ মুখে দুঃখ ফুটিয়ে বললেন, তোর অন্নকষ্ট ইচ্ছাকৃত। তুই যে বড় কুঁড়ে মেয়ে। এই এতখানি জায়গা, কত সব ফুলফলের গাছ ছিল—কী করেছিস সব। এ্যা?

কমলাক্ষ ঘুরে-ঘুরে চারদিকে গাছপালা দেখতে থাকলেন। কোনার জামগাছে সবুজ জাম ধরেছে থোকা-থোকা। বৃষ্টির ছিটে পেলেই রঙ বদলে বেগুনী হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেই বা কী? বারোমুতে লুটে থাকবে। দুটো আমগাছও আছে—একটা কলম গাছ। আমের চিহ্ন নেই। লিচু গাছও ছিল একটা। ঝড়ে ভেঙে যায়। কালো গুঁড়ি ঘিরে কাশ গজিয়েছে। আতা, পেয়ারা, ডালিম—কত গাছ ছিল। একটাও নেই। ফুলের গাছের মধ্যে শুধু একটা কাঠমল্লিকা টিকে আছে। আগাপাছতলা ফুল এবং মিঠে গন্ধ। জবা, টগর

কামিনী কত ফুল ফুটত। কিছু নেই। শুধু আগাছার মধ্যে খুঁকছে
একটা কঙ্কেফুলের ঝাড়। ওটা বস্তু।

হরিমতী খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, নতুন করে
কী দেখছেন বাবু? কবে শতুরের পাল শেষ করে দিয়েছে গাছপালা।
নালিশ নিয়েছে কেউ কখনও? পায়ে তো মাথা ভাঙতে বাকি রাখিনি
কান্নার।

হঁ। কমলাক্ষ তার দিকে ঘুরলেন। তাকে ডেকেছিলুম,
মধুপুরে গিয়ে মোতাই মিয়ার ছেলে পান্নাকে একটা দরখাস্ত দিয়ে আয়।
আমি পান্নাকে বলে দিয়েছি। ও লিখে দেবে। তুই টিপছাপ দিবি।

হরিমতী আঁচল কামড়ে বলল, কিসের দরখাস্ত বাবু?

কমলাক্ষ ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, বাস্তব্ভিটে দিচ্ছে সরকার থেকে।
যার যেমন ফ্যামিলি, তাকে তেমন। তাকে কাঠাটাক দেবে। পীরের
খান আর ঢেলাইচগীর মাঝখানে পাঁচ একর বাঁজা ডাঙা আছে
দেখেছিস?

হরিমতী মাথা দোলাল।

জায়গাটা ভালই। বানবস্তায় ডোবার যো নেই। এমনি উঁচু
জায়গা...কমলাক্ষের সিগারেট নিভে গিয়েছিল। ফুঁক ফুঁক করে
টেনে ফেলে দিলেন। ফের বললেন, কখন যাচ্ছিস পান্নার কাছে?

হরিমতী আস্তে বলল, কেন?

কী কেন?

একটু কেসে গলা সাফ করে হরিমতী বলল, জায়গা দিচ্ছে তা
আমিও শুনেছি। কানিকুড়ো, দুলাল, তারপরে যোগীকাকা—সবাই
নাকি বাউন্ডজায়গা পেয়েছে। তা আমাকে দেবে কেন বাবু? হরিমতী
শুকনো হাসল এবার। আমার তো এই পাঁচকাটা বাউন্ডজায়গা
আছে। যার জায়গা আছে, তাকে তো দেবার নিয়ম নেই।

কমলাক্ষ চোখ বড় করে শুনছিলেন। খ্যা খ্যা করে হেসে বললেন,
তুই এখনও গোবিন্দের কথা ধরে বসে আছিস বোষ্টুমী! নেহাত
মেয়েছেলে তুই—মাথার ওপর কেউ নেই! তাই এ্যাডমিন কিছু বলিনি।

ভেবেছিলুম, উঠে যেতে যে বলব, যাবি কোথা ? যদিইন বেঁচে আছিস, থাক । তারপর আমার জায়গা আমারই হবে ।

হরিমতী কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমার কাছে রেকোডপত্রের কাগজ আছে বাবু । সেটেলমেন্টোতে আমার নাম রেকোড হয়েছে । বছর-বছর আর খাজনা নিচ্ছে না—আমিও চুপ করে বসে আছি ।

কমলাক্ষ আরও জোরে হেসে ওর কথা উড়িয়ে দিতে চাইলেন । তারপর বললেন, আচ্ছা—এসব উদ্ভুটে বেআইনী কথাবার্তা কে তোর মাথায় ঢোকাল বলতো বোঠুমী ? যুধোশালা ?

হরিমতী নিজের পা দেখতে দেখতে বলল, তা কেন ? আমি তত বেবুক মেয়ে নই বাবু সে আপনি যাই বলেন । আমার ঘরে সব কাগজপত্র আছে ।

কমলাক্ষ হাত বাড়িয়ে বললেন, কই দেখা কী কাগজপত্র আছে । বের কর ।

হরিমতী শক্ত হয়ে বলল, দেখাব । দশজনকে ডাকুন । অঞ্চল-পেধানকেও ডাকুন ।

কমলাক্ষ জানেন এসব কথা তাঁকে শুনতে হবে । এর আগেও কথা তুললে হরিমতী এসব কথাই অগ্ৰভাবে বলেছে—একটা স্পষ্ট করে অবস্থা বলেনি । বৃত্ত কমলাক্ষ দাওয়ার চাটাইতে ধূপ করে গিয়ে বসে পড়লেন । ফের সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কী রে ? টানবি নাকি ? নে—বুদ্ধির ঘরে ধুঁয়ো দে আগে । তারপর কথা হচ্ছে ।

হরিমতীর সিগারেট টানতে প্রচণ্ড লোভ হচ্ছিল । অতিকষ্টে সামলে নিল । বলল, ছেড়ে দিয়েছি ।

ছেড়ে দিয়েছ ? চালাকি ? কমলাক্ষ একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন । যুধোশালার মাঠায় বসে বিড়ি ফুঁকতে দেখিনি বুঝি ? নে—এখন না খেতে ইচ্ছে করে । রেখে দে । পরে খাস ।

হরিমতী তবু হাত পাতছে না দেখে কমলাক্ষ জোর করে তার হাতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে প্রেমিকের গলায় বললেন, বোঠুমী ! তোর সঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলা থেকে ভাব । তুই বড্ড নিদয়া মেয়ে রে ।

নৈলে কিছু ভুলতিস না। যাক্ গে, সে-সব হুঃ মনে চাপা আছে, চাপাই থাক।

হরিমতী সিগারেটটা আলতোভাবে ধরে রইল। তার শরীর কাঁপছিল।
অস্বস্তি হচ্ছিল।

কমলাক্ষ চাপা গলায় ফের বললেন, মধুপুরে স্কুলের বোডিং থেকে রাততুপুরে পালিয়ে আসতুম তোর কাছে। মনে পড়ে ? সেবার প্রচণ্ড বান। তুই তোর বুড়োকে নিয়ে ঘরের চালে উঠে বসে ছিলি। রিলিকের নৌকো না আনলে কী হত বল ? তোদেরও নৌকোয় তুললুম, এ ঘরটাও জলে বসে গেল। চালটা ভাসতে ভাসতে চলে গেল। ইস ! কী সাংঘাতিক দৃশ্য !

হরিমতী মুসুরীভরা কুলোটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর আর বেকনোর নাম নেই।

কমলাক্ষ ফৌস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বানবস্থা আবার আসবে বোধুঁমী। তারপর উঠলেন। মুখ থমথম করছে। আধপোড়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন উঠোনের নগ্ন মাটিতে। নীল ধোঁয়া উড়তে থাকল।

তখন হরিমতী ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, বসুন। রাগ করবেন না। আমি সামান্য মেয়েমানুষ !

তক্ষুনি কমলাক্ষের থমথমে ভাবটা চলে গেল মুখ থেকে। ভুরু তুলে বললেন, কে মেয়েমানুষ ? তুই ? তুই পুরুষমানুষের কান কাটতে পারিস বাবা ! ওকথা বলিস নে !

কমলাক্ষ ফের বসলে হরিমতীও একটু তফাতে বসল। বলল, ভিটেমাটির জগ্রে দরখাস্ত করতে বলছেন। কতকাল ধরে সাধলুম,। বধবাদের মাস-মাস টাকা দিচ্ছে গরমেণ্টোর ঘরে—একটুকুন বলে দিন মিয়ার ছেলেকে। দিলেন ? আপনি পঞ্চাতের মেস্বার ! একটা কথা বললেই হয়ে যেত।

কমলাক্ষ জিভ চুকচুক করে বললেন, একদম খেয়াল হয়নি রে। বলেছিলি বটে। ঠিক আছে। হবে।

হরিমতী হাসল। হাসলে তাকে সুন্দর দেখায়। বলল, অন্নদির ‘পেনসেন’ হল। কেন? না—সে আপনার বাড়ির ঝি। তাও তো অন্নদির ঘরে অমন যোয়ান বোনপো। খেটেখুটে মাসিকে খাওয়াতে পারে।

কার কথা বললিস? বেন্দার? কমলাক্ষ ফাঁচ করে হাসলেন। বেন্দা অন্নকে খাওয়াবে? বেন্দা কী করেছে জানিস?

হরিমতী মাথা নাড়ল শুধু।

বেন্দা কোন গাঁয়ে কার বাড়ি চুরিচামার করেছিল। ফাঁড়ির পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম পেঁদিয়েছে। কমলাক্ষের চ্যাপটা শরীর এবং ভুঁড়ি ছলতে থাকল হাসির চোটে। একটু আগে দেখে এলুম, লেংচে বেড়াচ্ছে।

হরিমতী আস্তে বলল, শুনেছি।

উঠোনে ধোঁয়ানো সিগারেটটা হাওয়ার ধাক্কায়ে গড়িয়ে গেছে। নীল ধোঁয়াটা মরে এসেছে। কাল সন্ধ্যায় মধুপুর বাজারে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিলেন কমলাক্ষ। পুরনো সাঁতলাধরা মাল। পাড়া-গাঁয়ের দিকে এইসব মাল পাঠায় শহরের ডিলাররা। কমলাক্ষ টুকরোটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে আজ অত মনমরা দেখাচ্ছে কেন বোঁঠুমী? রাতারাতি বড্ড বুড়ি হয়ে যাচ্ছিল যেন।

হরিমতী ফের হাসল। আমি বুড়ি না তো কী?

কমলাক্ষ রসিকতা করবেন ভাবলেন। অনেকদিন পরে এভাবে নিরিবিলি এসে এবং বসে গল্প করছেন হরিমতীর সঙ্গে। মনে একটা টানাপোড়েন চলছে। একদিকে বৈষয়িক দ্বার্থ—সেটা ভারি জোরালোও বটে, অগুদিকে পীরিতিজ্ঞানিত পুরনো সম্পর্কের স্মৃতি, যা নটালজিয়া, এবং কিঞ্চিং স্নেহও। গ্রামের টেরে নির্জন এই বাড়ি এবং হরিমতীর মতো মেয়ে। মানুষের সত্যাব আসলে কুকুরের।

কিন্তু শেষপর্যন্ত শ্বাস ফেলে বললেন, আমিও বুড়ো হয়ে গেলুম শালা!

হরিমতী আঁচ করল, বাবুর মন নরম হয়েছে। স্নযোগ বুঝে বলল,

পুরনো কথাই এখন তুললেন, তখন একটা বলি। এ জায়গা-টুকুর ওপর আর চোখ দেবেন না বাবু। আপনার জায়গা-জমির তো অভাব নেই। তাছাড়া এ জায়গা আপনার বাবাঠাকুর আমাদের দান করে গেছেন। বিশ-বাইশ বছর এ জায়গা আমরা ভোগদখল করছি। স্বহৃৎ বসে গেছে। আইনে তো আর আপনি পান না বাবু! বলুন? আপনি তো লেখা-পড়া জানা লোক!

পাঁরিতের স্মৃতিজনিত নষ্টালজিয়ার কুয়াশা মুছে গেল মন থেকে। কমলাক্ষ চোখ কটমট করে বললেন, আইন দেখাচ্ছিস বোঁঠুনী? খুব আইনজ্ঞ হয়েছিস, বটে? তুই জানিস, ইচ্ছে করলে তোকে কবে এখান থেকে বের করে দিয়ে দখল করতে পারতুম? এখনও পারি, জানিস তুই?

কাল্লা চেপে হরিমতী বলল, পারলে বের করে দিয়ে দখল নিন।

ওরে! ওঠে দাঁড়ালের কমলাক্ষ। যুধোশালা তোকে বাঁচাবে ভাবছিস? ঠিক আছে।

বলে চ্যাপ্টা পা ছুটো থপথপিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হরিমতী কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইল। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল হয়তো। সত্যি যদি দখল নিতে আসেন, ঠেকাতে পারবে কি হরিমতী? সে ঘামতে থাকল। গলা শুকিয়ে গেল। যুধো বলেছিল, জায়গাটা বেচে দিয়ে মধুপুরে চলে যেও বোঁঠুনী। তিনশো না দেয়, কমপক্ষে ছশো টাকা তো দেবে কাঁসাপিছু। অনেক টাকা পাবে! তাই দিয়ে বরং পান সিগারেটের দোকান খুলবে।

রোদ বাড়ছে। ছপুর হয়ে এল। সকালে ছয়টা মুড়ি চিবিয়ে-ছিল। ক্ষিদেয় নাড়ি হু হু করে জ্বলছে। দাওয়ার কোনে উন্ন জ্বলে শুকনো পাতা গুঁজে দিতে দিতে মুসুরি সেক করতে থাকল হরিমতী। পুরনো স্মৃদিনের কথা ভেবে তার চোখে জল এসে গেল। সে গুণগুণ করে সুর ধরে প্রথমে গোবিন্দের জন্তু, পরে কিংকর বোরগীর জন্তু কাঁদতে লাগল।...

কলকাতার মেয়েটা

কলকাতা থেকে গ্রামের—যে কোন গ্রামের দূরত্ব বড় বেশি। কিন্তু গ্রাম—যেকোনো গ্রাম থেকে কলকাতার দূরত্ব খুবই কম। দ্বারকা নদীর তীরে এই গ্রাম বিলবাড়ির অসংখ্য লোক কলকাতা যাতা-য়াত করে কাজে বা অকাজে। কিন্তু কলকাতার কজনই বা এ গ্রামে আসে ?

পূর্বা নামে মেয়েটা এসেছে। কারণ বাইশ বছর আগে তার জন্ম হয়েছিল এ গ্রামে। তার বাবা মনমোহন কমলাক্ষের জ্যোতি-ভাই। কলকাতায় মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করতেন। প্রতি শনিবার বাড়ি আসতেন দুপুর রাতে। ফিরে যেতেন ভোররাতের বাসে। মাইলটাক দূরেই হাইওয়ে। কিন্তু বয়স বাড়লে আর থকল সইছিল না। ফ্যামিলি নিয়ে চলে যান কলকাতায়—তখন পূর্বার বয়স আট বছর :

এ পর্যন্ত বার তিনেক সপরিবারে এসেছেন মনমোহন। কমলাক্ষের বাড়িতেই দু-তিনটে দিন কাটিয়ে গেছেন। নিজের বাড়িটা কমলাক্ষকে বেচে দিয়েছিলেন। এখন সে বাড়ি ধুলিসাং করে কমলাক্ষ সবজিক্ষেত করেছেন। বাকি যেটুকু সম্পত্তি ছিল—একটা পুকুরের তিন আনা অংশ, একটা আমবাগানের চার আনা, একটা বাঁশবনের দু'আনা এবং বিঘে তিনেক ধানক্ষেত—ক্রমেক্রমে বেচে দিয়ে গেছেন কমলাক্ষকেই। শরিক হিসেবে কমলাক্ষের দাবি ছিল অগ্রগণ্য।

পূর্বারা তিনবোন একভাই। বোনদের মধ্যে পূর্বা ছোট। তার দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। দাদা তমালেরও হয়েছে। তমাল থাকে দিল্লিতে। ডিফেন্স কমিশনড ব্যাংকে চাকরি করে। পূর্বা তার দিদিদের চেয়ে বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রীহিসেবে ততকিছু মাথানা থাকায় টেনেটেনে গ্রাজুয়েট হতে পেরেছে। তাতেই মনমোহনের বেজায় গর্ব। কমলাক্ষের পাঁচটা মেয়েই স্কুল

পেরতে পারেনি। চারটেকে নানা জায়গায় গছিয়েছেন। ছোট মঞ্জুর বয়স বছর ষোল হয়েছে। পাত্র খোঁজা হচ্ছে। মঞ্জু দারুণ সুন্দরী। একটু জুংলী স্বভাবেরও বটে—এ জঙ্গলে গাঁয়ে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার বাবা কমলাক্ষ দুর্বলচেতা মানুষ—যদিও বৈষয়িক বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্টই আছে। কিন্তু তার মা কমলারানী খুব দঙ্কাল মেয়ে। মঞ্জু তার মায়ের স্বভাব অনেকটা পেয়েছে।

পূর্বা শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। তবে সে সবসময় সেজে গুজে ঝকঝকে হয়ে থাকে। মঞ্জুর পাশে তার চেহারা অনুজ্জল দেখাবার কথা—কিন্তু সে কলকাতার মেয়ে। নাগরিক হটা আছে তার চলনে-বলনে। তাই হঠাৎ তাকালে মঞ্জুর চেয়ে পূর্বাকেই সুন্দরী ভ্রম হয়। তাছাড়া গ্রামের খর রোদ, তীব্র বাতাস মঞ্জুর জন্মগত দেহবর্ণকে ক্ষয়ে ফেলে। কলকাতায় থাকলে হিডিক ফেলতে পারত।

পূর্বা ও মঞ্জু বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিল। গ্রামে মেয়েদের এভাবে বেড়ানোর রীতি নেই। কিন্তু পূর্বা এখন কলকাতার মেয়ে। বেড়ানো ব্যাপারটা তার অভ্যাসে এসেছে। বিকেলে বাড়ির ভেতর বসে থাকার মানে হয় না। তাছাড়া এই গ্রামটারও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আছে। মঞ্জু মায়ের ভয়ে ইতস্তত করেছিল। কিন্তু পূর্বা কাকিমার অনুমতি আদায় করে নিয়েছিল। কমলা বলেছেন, বেলা ডোবার আগেই বাড়ি ফিরবে। আজকাল সময় খারাপ। আর শোনো, নদীর ধারে যাচ্ছ তো? কখনো বাঁশবনের ভেতর দিয়ে যাবে না বা আসবে না। বাগদীপাড়া ঘুরে যেও। বরং নোলে-টোলে কাউকে সঙ্গে নিও ফেরার সময়।

মঞ্জু কিন্তু বাঁশবনের ভেতর দিয়েই পূর্বাকে নিয়ে এল। বাঁশবনটা তিন একর বিস্তৃত। মাঝখান দিয়ে গ্রাম থেকে নদীর তীরে আসার একফালি পথ আছে। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। এরই মধ্যে পোকা-মাকড়ের রাতের ডাক শুরু হয়েছে। কিন্তু ওপরে রোদের এলাকায় পাখাপাখালি দিনের বেলার গান গাইছে গলা ছেড়ে। তবু সব ভীষণ স্তব্ধ লাগছিল পূর্বার কাছে। পূর্বা আগেও এসে টের পেয়েছে গাছ-পালার জগতটা যেন উদ্বেগহীন আর নিরর্থক। মাঝামাঝি পৌছেই

তার গা ছমছম করছিল। ছোটবেলার কথা যতটুকু মনে পড়ে, তাতে গ্রামের ভূতপ্রেতের ব্যাপারটাই বেশি। এই বাঁশবন সম্পর্কে তার কোনো বিশেষ স্মৃতি নেই। তবে ভৌতিক অনুঘট্টা আছে বড় জোর। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ঘন ছায়ার ভেতর শুকনো বাঁশপাতায় নখের আঁচড় কেটে ছাতারে পাখির একটা ঝাঁক হল্লা করছিল। তারপর আবছা একটা খট্ খট্ শব্দ শোনা গেলে ছুজনে থমকে দাঁড়াল।

মঞ্জু কান পেতে শুনে বলল, কেউ চুরি করে বাঁশ কাটছে!

পূর্বা অবাক হয়ে গেল। ...চুরি করে বাঁশ কাটছে? কী হবে বাঁশ?

মঞ্জু চাপা গলায় বলল, বেচে আসবে বাজারে। বাঁশের খুব দাম যে!

পূর্বা বলল, এই বাঁশবনটা তোমাদের না?

হঁ। মঞ্জু এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বলল, পূর্বাদি, তুমি একটু দাঁড়াবে? আমি দেখে আসি কে বাঁশ কাটছে।

পূর্বা ভয় পাওয়া গলায় বলল, না না। বরং চলো, ফিরে গিয়ে বাড়িতে বলবে।

মঞ্জু চোখ নাচিয়ে বলল, ততক্ষণে চোর কেটে পড়বে। তুমি দাঁড়াও না বাবা একটুখানি। আমি চোরটাকে দেখে আসি।

মঞ্জু শুকনো বাঁশ পাতার ওপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। তখন পূর্বাও তার সঙ্গ নিল। ছুজনেই শুকনো মুখে হাসছিল। পূর্বা ফিসফিস করে বলল, এই! যাওয়াটা আমাদের ঠিক হচ্ছে না। আজকাল চোরেরা নাকি বড় ফেরোশাস? ওদের কাছে রিভলবার ড্যাগার, বোমা এইসব থাকে।

মঞ্জু বলল, একি তোমাদের কলকাতার চোর? পাড়াগাঁয়ের ছিটকে চোর। দেখবে, আমাদের টের পেলেই লেজ তুলে পালাবে।

কক্ষির খোঁচা লাগার ভয়ে মঞ্জু ছহাতে কক্ষি সরিয়ে পা মাড়াল। ফিসফিস করে পূর্বাকে সতর্ক করতে ভুলল না। খট্ খট্ শব্দটা মাঝেমাঝে

থেমে যাচ্ছে, আবার শোনা যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর পূর্বা বলল,
থাক্ গে। ফিরে এস মঞ্জু। আমার বড্ড ভয় করছে।

মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল, তোমায় তো বললুম ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো।
শুনলে না।

এইসময় শব্দটা ফের থেমে গেল। তারপর অন্তরকম শব্দ হতে
থাকল—সড় সড়, সড় সড়! শব্দটা একটানা। পূর্বা বলল, ও কিসের
শব্দ মঞ্জু?

মঞ্জু বলল, বাঁশটা ঝাড় থেকে টেনে বের করছে! এই! দেখে পা
ফেলবে! এখানে অনেক গর্ত আছে।

পূর্বা বলল, সাপটাপ নেই তো?

চুপ্। নাম করতে নেই। মঞ্জু হঠাৎ দাঁড়াল।

কী?

দেখতে পাচ্ছ চোরকে? ওই দেখ।

পূর্বা এতক্ষণে বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ছায়ার ভেতর আবছা একটা
মুতি দেখতে পেল। চোর এবার কাটা বাঁশের কঞ্চিগুলো ছাঁটছে।
অত্য়দিকে চোখ নেই তার। পূর্বা বলল, চিনতে পারছ চোরটাকে?

মঞ্জু গুম হয়ে গেছে। বলল, ছুঁউ। বেন্দাশালা।

পূর্ব হতভম্ব হয়ে গেল ওর মুখে শালা শুনে। বলল, ও কী মঞ্জু!
ও কী বলছ?

বলব না তো ছেড়ে দেব। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।—বলে মঞ্জু
কোমরে আঁচল জড়াল। তারপর পা থেকে স্ম্যাণ্ডেল খুলল। সেটা
হাতে নিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

পূর্বা জুতো খুলল না। আতঙ্ক, বিরক্তি ও হতাশাজনিত মোহভঞ্জে
তার অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু একমুহূর্তও একা হয়েপড়া তার পক্ষে
সম্ভব নয় এখন। সে অগত্যা মঞ্জুকে অনুসরণ করল। আগাছার
কাঁটায় কাপড় টেনে ধরছিল। গর্তে পড়ে হোঁচটও খাচ্ছিল। যখন
সে একটা শুকনো বাঁশের কঞ্চিতে আটকে গেছে, তখন এদিকে মঞ্জু
নিঃশব্দে চোরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেন্দা আপনমনে বসে বাঁশের কঞ্চি ছেঁটে ফেলছে। এই দুর্গম জায়গায় কেউ এসে পড়তে পারে, তার ধারণায় আসে না। বাঁ হাঁটুর কাছে আইনের মারের ব্যাথা এখনও ঘোচেনি। তাই বাঁ পা ভাঁজ করতে পারছে না—ছড়িয়ে রেখেছে সামনে। তারপর হঠাৎ পেছনে ‘এই শালা চোর’ শুনে ভীষণ চমকে ঘুরল সে এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মঞ্জুর নাকের ফুটো ওঠা-নামা করছে। সে হাঁফাচ্ছে। ফের স্বাস্থ্যস্বাসের সঙ্গে বলল, এই বেন্দাশালা!

অন্য সময় হলে বেন্দা থেকেশিয়ালের মতো গুলতির বেগে পিঠটান দিত। কিন্তু পায়ের যা অবস্থা, দৌড়ানোর ক্ষমতা নেই। বৃকেপিঠেও আবছা ব্যথা আছে। হাত দুটোর অবস্থাও করুণ! হাতে ত্রাকড়া জড়িয়ে দা ধরতে পেরেছে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে আর কিছু না পেরে ফাঁস করে বেলুনফাটার মতো হাসল। —মঞ্জুদিদি, ধরে ফেললে তাহলে?

মঞ্জু বলল দাঁত বের করতে লজ্জা করে না? চুরি করে বাঁশ কাটছিস যে।

বেন্দা দা রেখে ত্রাকড়াবাঁধা হাতদুটো মঞ্জুরপায়ের দিকে বাড়িয়ে বলল, পায়ের ধরি দিদি! এবারকার মতো ছেড়ে দাও। বাবাকে যেন বলো না। এই নাককান মলছি মঞ্জুদিদি, আর কক্ষণে বাঁশ কাটব না।

মঞ্জু একপা পিছিয়ে বলল, এত মার খেয়ে তোর লজ্জা নেই রে শালা।

বেন্দার মাসি অল্পপূর্ণা মঞ্জুদের বাড়ির ঝি। বেন্দা একসময় মঞ্জুদের গরুও চরাতে। কাজেই মঞ্জুর ‘শালার’ সঙ্গে সে পরিচিত। বাবুর মেয়ের জন্তে সে কতবার কত শালুক-পদ্ম তুলেছে মারাত্মক গভীর জল থেকে। কতবার বিল থেকে পাণিফল এনে দিয়েছে। এই বাবুর মেয়ের পাখি পোষার সাধ মেটাতে অসংখ্য গাছে সে চড়েছে। বাঁশবন থেকে তলদা বাঁশ কেটে নিয়ে খাঁচা বানাতে। সেদিনও মঞ্জু এমনি

করে পাশে দাঁড়িয়ে বাঁশের কঞ্চি ছাঁটা দেখেছে। আজকাল বেন্দার জীবনে সব ওলটপালট অবস্থা। দরমা থেকে হাঁস-মুর্গির ডিম, এবং এমন কী, একবার খিড়কির পুকুর থেকে জ্যোৎস্নারাত্রে জাল ফেলে মাছ চুরি করতে গিয়েই বাবুর বাড়ি তার পর হয়ে গিয়েছিল। আর সেই জালটাও ছিল চুরিকরা। মোহনবাগদীর জালটা আমড়াগাছে রাতের বেলা শুকোচ্ছিল। মোহন তাকে খুব স্নেহযত্ন করত বাবা-মা হারা ছেলে বলে। মোহন তাকে কোলে বসিয়ে এই গ্রীষ্মে তাড়ি খাওয়াত। মোহনই তাকে গাঁজার ছিলিমের জুড়িদার পর্যন্ত করেছিল। সেই মোহনও আজ সাত বছর আর রা কাড়ে না বেন্দাকে।

বেন্দা হুঃখিত মুখে বলল, আমার সব হুঃখের কথা যদি শোনো মঞ্জুদিদি, আমার ওপর রাগ করতে পারবে না। দিদি, তোমার মনটা খুব ভাল। আমি তো জানি। এই তুচ্ছ একটা বাঁশ—

মঞ্জু একপাটি জুতো তুলে মাথায় মারতে গিয়ে মারল না। বলল, তা চুরি করবি কেন রে বাঁদর? চুরি করবি কেন? চেয়ে নিতে কী হয় তোর?

কাকে চাইব? বেন্দা হাসল। বেশ তো, তোমাকেই চাইছি! এই বাঁশটা নিয়ে যেতে দাও। দেবে?

আগে চাইলে দিতুম। —বলে মঞ্জুর পূর্বর কথা মনে পড়ল। পূর্বা তখনও কঞ্চি থেকে শাড়ি ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। ছায়ার মধ্যে তার মুখটা অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা দেখে মঞ্জু খিলখিল করে হেসে ফেলল। মঞ্জু অনেকবার কলকাতা গেছে মনোকাঙ্ক্ষার বাড়িতে। কলকাতার ভিড়ে গঙগোলে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। কলকাতার মেয়েদের তার বড্ড ঝাঝ মনে হয়েছে। কিন্তু পূর্বাদির এই ঝাঝামির কোনো মানে হয়? একটা শুকনো আমোড়া বাঁশের কঞ্চি থেকে বেরুতে কেলংকারি করে ফেলল। মঞ্জু দৌড়ে গিয়ে ঝোঁকের বশে আস্ত বাঁশটা তুলে হাঁচকা টানে ছুড়ে ফেলল। তার ফলে পূর্বর আচলটা কলকর করে ছিড়ে গেল। পূর্বা রাগে গুম হয়ে গেল। মঞ্জু হাসতে

হাসতে তার হাত ধরে এই কঁাকায় টেনে আনার পর সে হাত ছাড়িয়ে
নিল।

বেন্দা ঘুরে ব্যাপ্যরটা দেখছিল। ফিক করে হেসে বলল,
কলকাতার দিদি যে। তারপর তাকড়াডানো হাত ঘোড় করে
কপালে ঠেকাল। ফের বলল, এসেছেন তা শুনেছি দিদি। ভেবেছিলুম,
ছুটো টাকা চাইব দিদিকে। কিন্তু বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরেও
মুখানা দেখতে পেলুম না।

মঞ্জু বলল, ও পূর্বা দি। তাহলে বুঝতে পারছ, গতরাতে তোমার
আনালার কাছে কে দাঁড়িয়ে ছিল ?

বেন্দা বলল, আবার কে ? এ বেন্দা হতভাগা। ও কলকাতাব
দিদি, দাও না ছুটো টাকা।

মঞ্জু বলল, চোপ্ শালা। অবশ্য হাসতে হাসতেই বলল।

পূর্বা রাগ করে বলল, মঞ্জু। বাড়ি যাই এস। শাড়িটা বদলাতে
হবে।

মঞ্জু বেন্দার দিকে চোখ কটমট করে বলল, বাড়ি যাব কী ? এই
চোরটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে না ?

তাহলে আমি যাচ্ছি। বলে পূর্বা পা বাড়াল। কিন্তু প্রাণ গেলেও
সে বাঁশবনে আর ঢুকছে না। সামনের দিকটা বেশ কঁাকা। বাঁশবনের
সীমান্তে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে।
সেদিকে বিকেলের সোনালী রোদের পর্দা টাঙানো। পূর্বা কয়েক পা
এগিয়ে গেল হনহন করে। তারপর থমকে দাঁড়াল।

মঞ্জু ও বেন্দা তার চলে যাওয়া দেখছিল। ছুঁতেনই মিটিমিটি
হাসছিল। তারপর পূর্বাকে দাঁড়াতে দেখে বেন্দা বলল, কী গো
কলকাতার দিদি ? সাপ-টাপ নাকি !

পূর্বা সত্যি একটা সাপ দেখতে পেয়েছে। সবুজ রঙের একটা সাপ
বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে জড়িয়ে একটা ঝোপে বারবার মুখ ঠেকাচ্ছে এবং
ভুলে নিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। জিভটা লকলক করছে। পূর্বা
এত ভয় পেয়েছে যে নড়তেও পারছে না। সাপটা একটু তফাতেই

আছে। কিন্তু সরু কাঁকা জার্সিগাটার মাথায় খেঁকে সে বেরবার রাস্তা আটকেছে।

বেন্দা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে একটা কঞ্চি-হাতে কাছে গেল। সাপটাকে খোঁচাখুঁচি করে তাড়িয়ে দিল। তারপর একগাল হেসে বলল, দুটো টাকা হল কলকাতার দিদি।

মঞ্জুর সাপের ভয় নেই, তা নয়। কিন্তু পাড়ারগাঁয়ে তো সাপ থাকবেই। একটু দেখে শুনে চলাফেরা করলেই হল। কাছে এসে সবুজরঙে সাপটাকে দেখে সে বলল, লাউডগা। না রে বেন্দা?

বেন্দা রে ঝোপে সাপটা ঢুকছে, সেই ঝোপটার মাথায় কঞ্চির বাড়ি মারতে মারতে বলল, যাঃ। যা চলো যা আপন ঠেঁয়ে। আর কখনো কলকাতার দিদিমণিকে ভয় দেখাবিনে।

সাপটা ঝোপের ভেতর নিখোঁজ হয়ে গেল। পূর্বীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চারপাশের সব সবুজে সে সবুজ সাপ কিলবিল করে বেড়াতে দেখছে। মঞ্জু তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ও পূর্বাদি। কী হল? যাও এবারে।

পূর্বা এবার হেসে ফেলল। হাসিতে রাগচুঁখ ছুই-ই আছে। বলল, যাঃ। কোনো মানে হয় না।

মঞ্জু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এই। তোমার মুখের রঙ চটকে গেছে।

পূর্বা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, বেশ হয়েছে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার টিপটা ঠিক করে দিই। রুমাল দাও। বলে মঞ্জু পূর্বীর কোমরে আটকানো ছোট্ট রুমালটা টেনে নিল। পূর্বা বাধা দিল। কিন্তু মঞ্জু ছাড়বে না। তার মাথার পাশে একটি হাত রেখে ধ্যাবড়ানো লাল টিপের চারদিক ঘষতে থাকল। বেন্দা অষ্টাবক্রের মতো দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল।

পূর্বীর একটু-আধটু মেক-আপের অভ্যাস বরাবর। কপালে মোটা করে একটা টিপ, ঠোঁটে রঙ এবং গলায় হাঁসুলিছাঁদের মালা পরে

বেরায়। শাড়ির রঙের সঙ্গে মেলানো টিপ বা লিপস্টিক। গ্রামে এসে এই সাজের জেল্লা কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে দেয়। মঞ্জুর মায়ের চোখে এটা ভীষণ দৃষ্টিকটু। আইবুড়ো মেয়ে কপালে টিপ পরবে কী। তার ওপর ঠোঁটে ওইরকল নিলাজ রঙ। শহরের বেশারাই তো এমন করে সাজে। কিন্তু পূর্বা গ্রাহ করেনি কাকিমাকে—কোনবারই পাত্তা দেয়নি। আর কমলাক্ষ বলেছেন, আজকাল টাউনের মেয়েদের এই রীতি। বনবাদাড়ে পড়ে আছি। তাই দেখতে পাও না।

কমলা মনেমনে অপছন্দ করেন ভাসুরঝিকে। মঞ্জুকে ভেতর-ভেতর কতটা নষ্ট করে দেয় কে জানে। শেষে ভাবেন, দু-তিনটে দিন বই তো নয়। তবে মঞ্জুও অন্য স্বভাবের মেয়ে। সাজগোজে তার একটুও মন নেই। যদি ওইরকম করে সাজত মঞ্জু, তার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারত পূর্বা।

কিন্তু এই এক স্বভাব মানুষের। গ্রাম থেকে যে কলকাতা চলে গেছে, সে যখন গ্রামে আসে অবারে-সবারে, পুরুষ হোক কিংবা মেয়ে—সাজগোজের চটকে ও জেল্লায় গ্রামে পড়ে থাকা লোকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায়। কমলাক্ষ সমঝে দিয়েছিলেন জ্ঞীকে। —দেখেছ তো? মণিদার মতো সাদাসিদে মানুষও কীরকম বিয়ের বর সেজে বিলবাড়ি আসেন। আধময়লা ধুতি আর হাফসার্ট পরে ফি-শনিবারে আসতেন। আজকাল এলে দেখে মনে হয় মধুপুরের সেকালের জমিদারকুলের কেউ। তবে কথা কী, আজকাল শহরে লোকের রোজ্জগারও বেড়েছে। কিন্তু কমলার মতে ভড়ং দেখাতে আসে। কলকাতায় দেখানো যায় না বুঝি, তাই এই বিলবাড়িতে।

মঞ্জু টিপ করে দিতে-দিতে ফিসফিস করে বলল, পূর্বাদি। আজ রাত্তিরে আনায় সাজিয়ে দেবে?

পূর্বা বলল, দেব। এখন ছাড়ো! চলো, ফাঁকায় বেরিয়ে যাই।

বেন্দা মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, খুব সুন্দর হয়েছে দিদি টিপখানা! আচ্ছা দিদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

মঞ্জু বাঁকা চোখে তাকাল। পূর্বা বলল, কী জিজ্ঞেস করবে?

আচ্ছা দিদি, মুখে কি ছগ্গোপিতিমার মতো ‘ভেলঘাম’ মেখেছেন? নাকি পালিকা?

মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল। পূর্বা অনুমান করল ‘ভেলঘাম’ বলতে কী বোঝায়। সেও হাসতে লাগল। এই সুযোগে বেন্দা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে কষ্ট করে বাঁশটা কাঁধে তুলল। মঞ্জু তাকিয়ে দেখল চোর তার কাজ শেষ করে পালাচ্ছে। সে গম্ভীর মুখে বলল, বেন্দা এই শেষবার কিন্তু।

বেন্দা দাঁত বের করে বলল, আবার? কক্ষণো না। তাই বলে অগ্নি কেউ বাঁশ চুরি করলে যেন বেন্দার ঘাড়ে ফেলোনা মঞ্জুদিদি। হ্যাঁ, হাতে-নাতে এমন করে ধরলে পরে না কথা। জুতো তো রইল! মেরো।

সে ছুজনের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতরে বাঁশটা নিয়ে চলল। বোঝা যাচ্ছিল, তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পূর্বা বলল, কোথায় নিয়ে যাবে বাঁশটা?

বেন্দা বলল, মধুপুরের বাজারে ননীদাকে বেচব। চায়ের দোকানের বেকি বানাবে। ও মঞ্জুদিদি, একটু সঙ্গে সঙ্গে এসো না দয়া করে। নৈলে লোকে ভারবে চুরি করে কেটে নিয়ে যাচ্ছি।

আসলে মঞ্জু চাইছিল, বেন্দা ও তার কাঁধের বাঁশ ঝোপঝাড়ের ভেতরকার গোপন আপদগুলোকে হটিয়ে দেবে। সবুজ সাপটা দেখার পর তারও অস্বস্তি হচ্ছিল। পাশাপাশি ছুজনে বেন্দার বাঁশের ডগার পেছনে পেছনে হেঁটে ফাঁকা চব্বাজমিতে গেল। তারপর মঞ্জু উত্থাপ্ত করতে শুরু করল বেন্দাকে। সে হঠাৎ-হঠাৎ বাঁশের ডগার দিকটা তুলে এবং এদিক ওদিকে নাড়া দিয়ে বেকায়দায় ফেলছিল ওকে। বেন্দা কাকুতি মিনতি করছিল। বাবুর মেয়ে বরাবর এমনি ছুট্ট এবং ফাজিল।

বেন্দা কাতরস্বরে বলছিল, দোহাই দিদি, নড়িও না। কাঁড়ির শালারা হাড়গোড় ভেঙ্গে রেখেছে।

পূর্বা বাধা দিলে মঞ্জু শাস্ত হ'ল। প্রকাণ্ড ভাঁড়ুলে গাছের কাছে এসে বলল, ওই দেখ দিদি। ওই ডালে যুমুচ্ছলুম। খামোকা আমাকে পাবড়া মেরে নামিয়ে বেধড়ক পেটালে। তারপর ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে আবার পান্টা করে ঠেঙালে। পেরাণটা শক্ত বলে যায় নি দিদি।

পূর্বা বলল, কোথায় চুরি করেছিলে ?

চুরি ? বেন্দা চোখ বড় করে বলে। আমি কি চোর ? না দিদি, খামোকা। মোটা সেপাইজী ডাণ্ডা মারে আর বলে, কেন গাছে চড়ে যুমুচ্ছিলি ? রোগা সেপাইজী গুঁতো মারে ধমকায়, কেন শালা.....

হঠাৎ কথা বন্ধ করে বেন্দা বাঁশ নিয়ে সড়াৎ করে নদীর গর্ভে চলে গেল। বাঁশের ডগাটা একটু হলেই পূর্বার পেটের নিচে গুঁতো মারত। সে ছিটকে সরে এসেছিল। তারপর নদীর খাড়াপাড়ের নিচে বেন্দা বাঁশসহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মঞ্জু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই লোকটাকে দেখে পালিয়ে গেল বেন্দা। দেখতে পাচ্ছ ? ওই যে।

পূর্বা দেখল, কোনাকুনি নদীর ওপারে ঢালু পাড়ে দাগড়া দাগড়া সবুজের মধ্যে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের চাষাভুষো মানুষ যেমন দেখতে হয়, তেমনি। হাঁটুঅন্ধি মালকোচা করে পরা কাপড়—খালি গা। কিন্তু লোকটার নাথায় সাধুসন্ন্যাসীর নতো চুলের ঝুঁটি। পূর্বা বলল, কে ও ?

মঞ্জু বলল, যুধিষ্ঠির পূর্বাদি। তরমুজ খাবে ?

পূর্বা মাথা নাড়ল। কিন্তু মঞ্জু তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল এবং পা বাড়াল। পূর্বা অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করল। হেঁড়া আঁচলটাই তার এখন অস্তিত্বের কারণ। ঢালু ঘাসজমির ওপর দিয়ে নদীতে নামতে-নামতে পূর্বা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল।

নদীখাত সোনালী বাগিতে ভরা। শুধু শেষপ্রান্তে তিরতির করে একফালি জল বয়ে যাচ্ছে। একটু তফাতে খানিবটা দহ রয়েছে। দহের মাথায় চকচক করছে একফালি ঘাটের রাস্তা। ওপরে পাড়ে

একটা বাঁকটেরা হিজলগাছ। তার ওপাশে যুধিষ্ঠিরের ছোট্ট কুঁড়েঘর।

মঞ্জু বলল, যুধোকাকার সঙ্গে বাবার মামলা হচ্ছে জমিজমা নিয়ে।

তাহলে ওর কাছে যাচ্ছ যে? পূর্বা অবাক হয়ে বলল।

মামলা হচ্ছে বাবার সঙ্গে। তাতে আমার কী? বলে মঞ্জু জুতো খুলে পূর্বার হাত ধরে জলে নামল। পূর্বাও জুতো খুলে নামল। বিকেলের রঙ ফিকে হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। নদীর বুকে ছায়া ও আলো মেশামেশি হয়ে আছে। ওপরে উঠতে অসুবিধে হল না—এ পাড়টা বেশ ঢালু। নদীর কাঁধের এইসম জমিকে বলে ‘কাঁটা জমি’। চৈতালী ফলিয়েছিল চাষীরা কোথাও-কোথাও। এখন ধু ধু করছে। কোথাও কুমড়ো, তরমুজ, লংকার ঝাড়। বেগুনক্ষেতও। যুধিষ্ঠির দেখছিল এদের। কাছাকাছি গেলে হামলা। এই। আমি ভাবছি দিনছপুরে ই কী উপদ্রব রে বাবা!

মঞ্জু বলল, উপদ্রব মানে? ও যুধোকাকা, উপদ্রব আবার কী?

যুধিষ্ঠির বলল, ওই হল আর কী। তা হ্যাঁ গো মঞ্জুমা, এটিকে তো চিনলুম না?

শ্রাকামি করো না। কলকাতার জেঠামশায়ের মেয়ে।

যুধিষ্ঠির উচু মানুষ। মুখ নামিয়ে পূর্বাকে দেখে বলল, ইনি বড় না ছোট, না মধ্যমকথা বড়বাবুর।

মঞ্জু হাসতে হাসতে বলল, ইনি ছোট।

অ। তা দেখে থাকব। যুধিষ্ঠির পা বাড়িয়ে বলল। এস মাজননীরা। ওপরে পোস্কের জায়গায় এস। তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখে নিল, মঞ্জু হাঁটু হুমড়ে বসে একটা প্রকাণ্ড তরমুজ টানাটানি করছে। বাঁটা ছেঁড়া সহজ নয়। তাই বলল, উরে বস। রাখো, রাখো। তোমরা ওপরে গিয়ে বসো। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ওপরে হিজলতায় পরিষ্কার নিকানো মাটি। ছোট্ট খড়ের কুঁড়েঘর। একটুকরো বকবকে দাওয়া। দাওয়ায় তাল্লাই পেতে বসে কেউ তাড়ি খাচ্ছিল। মাটির ছোট্ট হাঁড়ির মুখে শাকডাবাধা—অর্থাৎ ছাঁকনা।

ছোটো খালি ঐটো গেলাস ছুধের মতো সর লেগে আছে ভেতরে। মঞ্জু মুখ টিপে হেসে দাওয়ায় উঠল। তারপর ভেতরে উঁকি মেরে বলল, হুঁ হুঁ। ধরে ফেলেছি বেরিয়ে এস বলছি—নইলে ভীষণ চাঁচিয়ে সবাইকে শুনিবে দেব।

হরিমতী থি থি করে বেজায় হাসছিল। মাতাল হয়ে গেছে খানিকটা। আলুথালু চুল, এলোমেলো কাপড় এবং কাদামাটির চেহারা। দাওয়ায় বেরিয়েই জ্বিত কেটে বলল, ও মা। ওটা বটাঠাকুরের কলকাতার মেয়েটা না? ছি, ছি, কী লজ্জার কথা মঞ্জু, তুমি কাজটা বাপু ভাল করলে না।

মঞ্জু ধমকাল।....খামো। লজ্জা, না হাতি। ও পূর্বাদি, বোঠুমী-কাকী কেমন ভোল বদলেছে দেখছ? চিনতে পারছ না? আমাদের বাগানে থাকে—সেই যে মালী বউ। তুমিইতো কত গল্প করছিলে।

পূর্বা হরিমতীকে চেনে। বলল, বোঠুমীকাকী, কেমন করে ওসব খাও, একবার দেখাও না।

হরিমতী তক্ষুণি পা ছড়িয়ে বসে গেলাসে তাড়ি ঢালল এবং ঢকঢক করে গিলে বলল, দেখলে তো? তারপর জড়ানো গলায় গান গাইতে লাগল। এ হরিমতী অণু হরিমতী।

বেন্দার নতুন আশ্রয়

হাইওয়ের গতি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর। তার পশ্চিম পিঠে যধুপুর, পূর্বে শাড়ি মাঠ ধু ধু। সব টাউস চাঁদ উঠেছে এবং আলোআঁধারে জটপাকানো জ্যোৎস্না ঝিম মেরে বসে আছে মাঠের দিকে। রাস্তার ধারে জুগজুগ করছে বিছাতের পিদৌম। ধোঁয়ায়-ধুলোয় ত্রিয়মান ননীর চায়ের দোকানে পাঁউরুটি কামড়ে চোয়ালে ব্যথা ধরে গেছে বেন্দার। ছগেলাস চায়ে ভিজিয়েও এ জিনিস নরম হবার নয়। চোয়ালে ঘুষি মেরেছিলেন প্রথম দর্শনেই কাঁড়ির এ এস আই লক্ষ্মীবাবু,

যাকে সবাই জমাদারবাবু বলে ডাকে। বেন্দার শক্ত খাও চিবিয়ে খেতে দেরি হবে।

ননী ঠকাবেই জানা কথা। চোরাই মাল তা কি জানে না সে? একথানা পুঠু বিশ-পঁচিশ ফুট বাঁশের দর দশটাকা। বেন্দাকে আড়াই টাকা দিয়ে ননী ব্ল্যাকমেজ করেছে। তবু কতদিন পরে টাকা ছুঁল বেন্দা। মরা ধড়ে প্রাণ এল। খালি হ্যা হ্যা করে হাসে। কিন্তু চোয়ালে ব্যথা বলে ঠোটটুটো শুওরের মতো গোল হয়ে যায়। যাক। প্রাণভরে হাসতে পেরেছে তো।

কাস্তুর কাছে একখিলি পান খেয়ে সিগারেট টানতে টানতে বেন্দা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গাঁয়ে ফিরছিল। আজকের আনন্দ ভয়হীন, নিখাদ। বাবুর মেয়ের কাছে বলেই নিয়েছে বাঁশখানা—ননী তা না মানুক, সে নিজে তো জানে—ও চুরি নয়। ধম্মের বাঁশ। সুতরাং ত্রিঙ্গ পেরিয়ে মুখ উচু করে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেন্দা চেরা গলায় চ্যাচামেচি করে গান ধরল। তারপর বাঁয়ে যুরে পূবমুখে হয়ে নদীর ধারে বাঁধের পথে নামল। সামনে চাঁদের ততক্ষণে ফুলো ভাবটা কমেছে। আকারে ছোট হয়েছে। আজ রাতে কী মোলায়েম হাওয়া শৃংখ নদীর ওপর বয়ে যাচ্ছে। গানের ঘোরে বেন্দার হঠাৎ মনে হল, তার একটা বউ থাকলে খুব ভাল হত। বছর দশেক আগে বেন্দা তখনও রাখাল—যহু ছুতোরের ছাগলচরানী মেয়েটাকে নিরিবিলি পেয়ে প্রেমভিক্ষে করে ফেলেছিল। ছুঁড়ি তাকে দেখলেই ফিকফিক করে হাসত। অথচ এই সামান্যতেই যহুর কানে তুলে দিলে যহু ঘিসকাপ হাতে বেন্দাকে মাঠে-মাঠে তাড়া করে বেড়িয়েছিল। শালা ভাগ্যটাই এমন বেজম্মা। এমন তো নয়। গাঁ-গেরামে কেউ পীরিত করে না। বেন্দার ভারি অবাক লাগে, কী গুণ থাকলে মেয়েদের মন পাওয়া যায়?

অল্পমাসি বলেছিল, যদি সুপুতুর হয়ে থাকতিস আর রোজগার পাতি করতিস সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে দিতুম। তা সে তিনকুড়ি টাকা লাগুক আর পাঁচকুড়ি। আমি দিতুম। কিন্তু জানি, তোর রীতি

উঠে। তুই চোটাঁমি শিখেছিস। সবাই তোকে চোর বলে জানে।
তোকে মেয়ে কে দেবে রে বাটপাড় ?

মাসি তার মার খাওয়ার পর একটু নরম হয়েছে বটে, খেতেও
দিয়ে চাইলে পরে—কিন্তু ভুলেও বলছেন, বেন্দা রে! এবারে যা
হবার হয়েছে। মুনিশ খেটে খা। সুহালে থাক। বিয়ের কনে
দেখি।

টাকার আনন্দ ক্রমে মরে গেল বেন্দার। মাসি তার বিয়েদেবে না।
তাহলে কেমন করে সে বিয়ে করবে? এ বয়সে একটা মেয়েমানুষ
না থাকলে যে বেন্দার মতো পুরুষ মানুষের রাত পোহানো ভার। মন
এত খারাপ হয়ে গেল যে বেন্দা ঝাঁকের মুখে নদীর খাতে নেমে গেল।
বালির চরায ধুপ করে বসে ঘরে যাওয়ার কথা ভাবতে থাকল। রাগ
করেই ভাবতে থাকল। ধূস শালা এমনি করে বাঁচতে আছে
মানুষের? পাথ-পাথালিও এই খরার মাঝে জোট বেঁধে দূরে। রুষ্টি
পড়লেই ডিম পাড়বে বাসায়। ছানা বেরবে। কে না জোট বাঁধবে।
কেনা জোট বাঁধে? সাপ আর সাপিনাও জোট বেঁধে আজকাল
কৌসকৌস করে আনন্দে। এখন জোট বাঁধার ঝুঁক। অথচ বেন্দার
জোটবাঁধার যো নেই। সে মানুষ। মানুষের জোড় বাঁধতে পয়সা
লাগে। অনেক পয়সা। অত পয়সা যোগাড় করতে হলে তাকে
মুজফরের মতো ডাকাত হতে হয়। কিন্তু মুজফর হওয়া কি সহজ
কথা?

সাননে নদী একটু বেকে গেছে। খাড়া একটা লম্বাটে অন্ধকার
দেয়ালের নিচে খানিকটা জ্যোৎস্না মেয়েমানুষের মতো আদরে গুয়ে
আছে। গুয়ে থাকতে-থাকতে জ্যোৎস্নাটা নড়তে লাগল। নড়তে
নড়তে উঠে দাঁড়াল। তখন মেয়েমানুষের মতো জ্যোৎস্নাটাকে কালো
দেখাল। বেন্দা কৃতকৃতে চোখে দেখতে দেখতে ভাবল, ব্যাপারটা
কী হল? ভূতপ্রেতের ওপর বিশ্বাস থাকলেও ভয় তার নেই। সে
রাত চরা ছেলে বরাবর। এখন তো সওয়া কুড়ি বছরের ডাগর
যোয়ান। ওই যে আবছা কালো কী একটা আসছে, ওটা ভূত হোক

‘আর যাই হোক, বেন্দা না দেখে ছাড়বে না। সে উঠে দাঁড়াল।

একটু পরে টের পেল, ওটা মানুষ। এবং মেয়েমানুষ!

বেন্দার বুকটা ধড়াস করে উঠল। কে এমন মেয়েমানুষ নিশি-
রাতে নদীর চড়ায় অমন করে আসছে? কারুর বউ পালাচ্ছে নাকি?
বেন্দা কখনও স্বচক্ষে দেখেনি, শুনেছে—কেমন করে রাতবিরেতে বউ
পালিয়ে বাপের বাড়ি যায়। তখন দুই মানুষের পাল্লায় পড়লেও
ভয়ে লজ্জায় চুপ করে থাকে।

তাহলে কি কোনো দেবদেবী উড়ে যাচ্ছিল আকাশপথে এবং যেতে
যেতে বেন্দার মনের সাধ টের পেয়ে এই ব্যবস্থা করে গেল? তুরুতুর
বুকে বেন্দা পা বাড়াল। বাঁ ঠ্যাঙের যন্ত্রণাটা ভুলে গেল একেবারে।
শেয়াল যেমন করে ছাগলের দিকে চুপিচুপি এগিয়ে যায়, তেমনি করে
এগোল। শেষ কয়েকপা ছুটে গিয়ে লাফ দেবে। যা আছে বরাতে।

বেন্দা মনে মনে সেই দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে সাধছিল, কখনও জীবনে
মেয়ে সঙ্গ করিনি বাবারা, নায়েরা। অন্তত এই একবার দয়া করো।
নাককান মূলে বলছি, আর চাইব না। মাত্র একবার।

মেয়েমানুষটা টলতে টলতে একবার এদিকে একবার ওদিকে
যাচ্ছে। ডাইনে খাড়া পাড়। কোথাও ঝোপ ঝুঁকে এসেছে।
সেদিকে গিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। আবার
বালির চড়ায় পা বাড়াচ্ছে। তার মধ্যে বারকতক আহাড়ও খেল।

শেষবার আহাড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেন্দা গিয়ে তাকে ধরল।
তারপর বুকের ভেতব কোন পড়ার শব্দে ঘাঁচ করে বলে উঠল, অ্যাঁই
বোঠুনীমাসি। ই কী গো।

হরিমতী চোঁচাতে গিয়ে থিক থিক করে হাসতে লাগল। বেন্দা
নাকি বে? আমার কপাল বাপ, আমার ভাগ্য।

বালি থেকে উঠে গা ঝাড়ছিল বেন্দা। হাসছিলও। ইটা কী হল
বোঠুনীমাসি? এঁয়া? যুধোকাকার ঠেঁঞে খুব তাড়ি মেরেছো।
মেয়ে এই অবস্থা। এঁয়া?

হরিমতী তখনও পা ছড়িয়ে বসে আছে বালির চড়ায়। হাসিটা

ক্রমে মরে এল। তারপর কৌস করে কঁদে ফেলল।

বেন্দা জানে, নেশার নিয়ম এই। হাসবে, আবার তক্ষুনি কাঁদবেও। বোষ্টুমী অবশি খুব সহজে মাতাল হয় না। বেন্দা দেখেছে অনেকবার। কুনাইপাড়া থেকে বেন্দা গত খরার মাসে তালগাছে উঠে তাড়িচুরি করে এনেছিল। বাবুর বাগানের ওদিকেই কুনাইপাড়া। তাই হরিমতীর চোখে পড়ে যায়। হরিমতীর ঘরে বসে তাড়িটা খাওয়া হয়েছিল— হরিমতীর ভাষায়, ‘মায়ে-পোয়ে শাবাড় ক’বি আয়।’

বেন্দা জেনে শুনেও বলল, তা কাঁদবার কী আছে বোষ্টুমীমাসি? বিরিজ যদি গেলে ওপরে ওঠার রাস্তা পেতে—সে তোমার যতই নেশা হোক। কাঁদা-কাঁদি রেখে এখন ওঠ।

হরিমতী তবু কাঁদে।...তোকে ঠাকুর মিলিয়ে না দিলে আমার কী হত রে বেন্দা?

বেন্দা রেগে গেল।...অত গেলো কেন এ বয়সে—সামলাতে না পারবে যদি? একথাতেও তার রাগ পড়ল না। ফের মুখে ভেংচি কেটে বলল, যুধোর ঘরে জায়গা হল না, না? তোমার বলিহারি যাই বাপু। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেহ, এখনও রঙ গেল না। শালা।

থুথু ফেলল যে। এখন কড়া নীতিবাগীশের মতো ধর্মধর্ম হ্রায়-অহ্রায় পাপ-পুণ্যের জ্ঞানে বেন্দার নাথা টগবগ করে ফুটছে।

হরিমতী তার পায়ের কাছে শুকনো বালিতে থাপ্পড় মারল। ...বেন্দা! মা-মাসির সঙ্গে ঠাণ্ড করে কইবি।

বেন্দা দমল না। বলল, তুমি মা-মাসি? ওরে আমার কে রে। আমার মা-মাসি হলে এতক্ষণ বালিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতাম না? রাগ বাড়িও না বোষ্টুমীমাসি।

হরিমতী এবার ডুকরে উঠল, অ্যাই বাপ বেন্দা, আমি রাতকানা রে।

সঙ্গে সঙ্গে বেন্দা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটু চূপ করে থাকার পর কৌস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, অ। এতক্ষণে সে

বুঝতে পেরেছে, কেন হরিমতী অতদূর থেকে এদিক-ওদিক করতে-করতে আসছে। সে চুঃখিত মনে ফের বলল, এতক্ষণ বললেই পারতে বোষ্টুমীমাসি। তাই রোগ তো তোমার ছিল বলে শুনি নি। কবে বাধালে ?

হরিমতী কান্নার সুরে বলল, এক মাস হতে চলল রে বেন্দা। রাত এলেই আমি জন্ম রে। ওরে বেন্দা, আমি চিরকালের রাতচরাণী—আমার এ বিপদ কেন হল রে ?

বেন্দা দেখল, মেয়েমানুষের কাঁছনি একবার শুরু হলে এই নদীতে যতক্ষণ না বান ডাকবে, ততক্ষণ থামবে না। অতএব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু দিন ফুরুলেই যে কানা হয়ে যায় রাতের মতো, সে কোন আক্কেলেই বা ঘর ছেড়ে বেরোয় ? তাও সহজ বেরুনো নয়, নদী পেরিয়ে পৌঁরিভের নাগরের কাছে গিয়ে হাজির। বোঝা যাচ্ছে, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। নৈলে ওর কাছেই মনের সুখে রাত কাবাড় করে ভোরবেলা লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ি ফিরত।

বেন্দা হাত বাড়িয়ে বলল, কই। ওঠ। আমাকে ধরে-ধরে এস।

হরিমতী গুনগুনানি বন্ধ করে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওর হাত ধরল। বেন্দাও এখন খুব লক্ষ্মী ছেলে। যেতে-যেতে হরিমতী ওর হাতে জড়ানো পটি ছুঁয়ে আস্তে বলল, পুলিশে খুব মেরেছিল তোকে রে। এখনও ব্যথা আছে বাবা ?

বেন্দার মন নরম হয়ে গেল। বোষ্টুমীর মনটা বরাবর বড্ড ভাল। বেন্দা নরম সুরে বলল, তা একটু-একটু আছে এই দেখ না—যাচ্ছি বটে, কিন্তু সমান তালে কি পা পড়ছে ? খোঁড়াচ্ছি কেমন, দেখনা। হাত-পা দুই-ই ঠুঁটো।

পায়েও মেরেছে সোনা ? বলে হরিমতী অগ্নি হাতটা দিয়ে উরু ছুল।

বেন্দা বলল, ও পায়ে না। বাঁ পায়ে ব্যথা।

চল বাপ পা চালিয়ে। দাওয়ায় উশুড় হয়ে শুবি। লম্পার তেল মালিশ করে দেব।

নদীর ভাঙা পাড়ের ঢালু বেয়ে হরিমতীকে ওঠাতে যত, নিজেকে ওঠাতেও তত কষ্ট হল বেন্দার। নিচু বাঁধে উঠে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল দুজনে। এবার হরিমতীর হাত বেন্দার কাঁধে। চলতে চলতে হরিমতী মুখ খুলে দিল।...বাবুর বাগানের পুরনো কথা ফুল-ফলের কথা। তারপর বাবুর শাসানির কথা। বেন্দার কান শুনছে না। মন উদাস-উদাস লাগছে। চাঁ-চাঁ মাথার ওপর চলে এসেছে প্রায়। বাঁয়ে ওপর মাঝে-মাঝে ঘন ছায়া আর জ্যোৎস্নার টানা-পোড়েন চলছে। বাঁয়ে নদীর ওপারে ধু ধু মাঠে আলোআঁধারি হুসরতা। কী একটা পাখি ডাকছে কোথায়। ডাইনে ক্ষেত, ঝোপঝাড়, গাছগাছালির ওধারে গ্রাম এখন নিঃস্বপ্ন। কুকুর ডাকছে চৌকিদারের বাড়িতে। একটা লঠনও দেখা গেল তুলতে-তুলতে মিলিয়ে যেতে। ভাঁড়ুলে গাছটার কাছে এসে বেন্দা ভাবল, বোষ্টুমীকে সেদিনকার ঘটনাটা বলবে। কিন্তু বোষ্টুমী বকবক করছে আপন খেয়ালে। এইসময় হাওয়ার ঝাপটায় গ্রাম থেকে অজু নাপিতের কেন্দ্রনে দলটার ঝাঁকবেঁধে গাওয়া গানের কলি আর খেলের শব্দ ভেসে এল। মিলিয়ে গেল। আবার ভেসে এল। আবার মিলিয়ে গেল। বোশেখ মাসটা গোটা এরকম চলবে।

আগড় ঠেলে 'বাবুর বাগানে' অর্থাৎ নিজের বাড়িতে ঢুকে হরিমতী চাপা গলায় বলল, নেশাটুকুন কখন চটে গেছে বুঝলি বেন্দা? পেলো আবার খেতুম, তোর দিবি। তারপর চাপা খিকখিক হাসি।

বেন্দা বলল, আনারও ইচ্ছে করছে। একটুখানি ভাবতে দাও বোষ্টুমীমাসি।

দাওয়ায় উঠে বেন্দার কাঁধ থেকে হাত তুলে হরিমতী আঁচলের গিটে বাঁধা চাবি ঝনঝনিয়ে তাল্লা খুলল ঘরের। নিজের ঘরসংসার বলে সবটাই মুখস্থ ছড়ার মতো। ভেতরে ঢুকে তাল্লাই আনল। লম্প আনল হিস হিস করে হেসে বলল, যুধোর শলাই বাকশোটা নিয়ে এসেছি। মিনসে মড়া হয়ে পড়ে আছে নদীর পারে। সকালে খুব গালমন্দ করবে।

বেন্দার কানে গৌজা সিগারেটটার কথা মনে পড়ল। দ্রুত কান খুঁজে সেটা পেয়ে খুশি হল। বলল, দাও। আমি জ্বালি।

লম্পটা চৌকাঠের ওপারে ঘরের মেঝেয় ঠেলে দিয়ে হরিমতী পা ছড়িয়ে বসল।...রাতকানা হয়ে মনে শান্তি নেই, বাবা। তারপর সিগারেটের গন্ধ পেয়েই নড়ে উঠল। ফিক করে হেসে বলল ফের, দিস মাসিকে ছুটান। গন্ধটা বেশ ভাল।

লম্পের আলো হরিমতীর আন্ধেক শরীরে পরেছে। বেন্দার ইচ্ছে হল, বোষ্টুনীমাসিকে আরও খুশি করবে। বলল, খাওয়াদাওয়া কী হল যুধোর ঠেঞ্চে? না হলে বলো, একখানা পাঁউরুটি আছে সঙ্গে। সকালে খাব বলে রেখেছি।

হাত বাড়িয়ে হরিমতী বলল, দে না, খাই। আজ ভাত-টাত খাইনি। ছপুরে মোড়লগিনি দুখানা পিঠে দিয়েছিল। ভাত খাব বলে যুধোর কাছে গেলুম। তো কপাল, মিনসে পাঁউরুটি আর বেগুনের ঝোল খেয়েছে। সেই ঝোল দিয়ে তাড়ি খেলুম। তারপর বাবুর মেয়েরা গিয়ে পড়ল।

কথা বাড়তে না দিয়ে বেন্দা পাহার দিক থেকে নেংটির কোণায় বাঁধা পাঁউরুটির টুকরো খুলে বলল, খাও। শক্ত লাগবে। জলে ভিজিয়ে খাও বরঞ্চ।

হরিমতী হাসল। আমার দাঁত খুব শক্ত রে বেন্দা।

তাহলে খাও।

খাই। হরিমতী কুড়মুড় করে পাঁউরুটি চিবুতে থাকল। সিগারেটের কথা মনে পড়িয়ে দিতে ভুলল না। বেন্দা এখন লম্পী ছেলে। আধখানা পুড়লে ঘষটে নিবিয়ে রাখল। হরিমতী চিবুতে চিবুতে বলল ফের, তোর মতো কেউ সঙ্গে থাকলে আমার কি ভাবনা ছিল? আগের মতো বাঘিনী হয়ে বেড়াতুম।

বেন্দা গলার ভেতর আবেগ রেখে ঢোক গিলে বলল, তুমি ঠাই দিলে সঙ্গে থাকব না তো কি? আমার আর কে আছে বলো? মাসি আপন মায়ের বোন বটে, কিন্তু শত্রুর।

থাকবি বেন্দা ?

হুউ।

পাঁউরুটি খেয়ে ঘরে ঢুকে মাটির ঘড়া থেকে এনামেলের খুরিতে জল ঢেলে ঢকঢক করে খেল হরিমতী। বেন্দার পয়মায়ু প্রার্থনা করল। তারপর তেমনি করে বসে সিগারেট চেয়ে নিল। রাতকানা মানুষ—কিন্তু লম্পের আগুন টের পাচ্ছে। সিগারেট ধরিয়ে ফুঁক ফুঁক করে ধোঁয়া ছেড়ে হরিমতী কেম- ভংগিতে হাসতে লাগল।

সেই কাল হল বেন্দার। যাকে মাসি বলেছে, তার দিকে কু-চোখে তাকাতে মনে ঢেঁকির পাড় পড়ে। কিন্তু কী সুন্দর মেয়ে মানুষ দেখাচ্ছে হরিমতীকে। বিভ্রান্ত বেন্দা বলল, পায়ে ব্যথা না থাকলে কানুর গাছগুলোতে চড়ে এক্ষুনি মাল সাবাড় হুম। চারটে গাছ কুড়ুলে এক হাঁড়ি কি হবে না ? বিকেলে নামিয়েছে—এতক্ষণ অনেকটা ঝরে ভাঁড়ের তলা ভরে উঠেছে। তোমার ঘরে হাঁড়ি নেই বোষ্টুমীমাসি ?

হরিমতী বিহ্বলতায় চঞ্চল হয়ে বলল, আছে।

একটি দড়িও দাও। হাঁড়ির মাথায় বেঁধে কোমরে ঝুলিয়ে নিয়ে উঠতে হবে তো। কবে একটা ছাগল পুষেছিল হরিমতী। শেয়ালের ভোগে লেগেছিল বিশ টাকার মাংস। সেই থেকে আর ওপথে পা বাড়ায় নি হরিমতী। ইদানিং আর শেয়াল নেই এতদঞ্চলে। বাগদী পাড়া-কুনাইপাড়া-বাউরিপাড়ার নেয়েরা মিলে ছাগলপালন কোঅপারেটিভ করেছে কমলাক্ষ প্রমুখের উত্থোগে। সরকার একটি প্রকাণ্ড সঙ্কলীয় পাঁঠা উপহার দিয়েছেন। মধুপুরে ব্যাংক বসেছে। ব্যাংকের টাকায় চলছে ছাগলপালন। হরিমতী এসবেও নেই। ভিড়ের দিকে পা বাড়াতে তার চিরকাল বড় অনিচ্ছা।

চালের বাতা চুঁড়ে দড়িটা পেলে বেন্দা। একটা হাঁড়িও পেল। পা বাড়িয়ে সে জানাল, ব্যথাটা আর নেই যেন। জোৎস্নারাত্রে ছায়ার রঙ ঘন কালো। সেই কালোর ভেতর আত্মগোপন করে সে হাঁটতে থাকল। সামনের 'জোল' অর্থাৎ নিচু জমিগুলোর ওপরদিকে

‘ভাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো।’ চাঁদের আলোয় বিদ্যুটে লাগে তাদের চেহারা। বেন্দা জানে, কয়েকটা বাঁজা গাছ মালিকদের কাছে ভাড়া নিয়ে তাড়ি লাগিয়েছে কানু কুড়র। রোজ বিকেলে বেচতে যায় মধুপুরের বাজারে। ড্রাইভাররা লরি দাঁড় করিয়ে ছুঁচার গ্রাস করে গিলে যায়। কানু লাল হয়ে যাচ্ছে বলে বেন্দার ধারণা।

বেন্দা চলে গেলে আন্দাজ করে পা ফেলে হরিমতী জ্যোৎস্না ধোয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। দৈবাৎ ধরা পড়লে বেন্দা কি তার নাম করবে? করুক। কেউ বিশ্বাস করবে না। বেন্দা ছোঁড়ার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক?

হাওয়ার ব্যাপটানিতে আবার গ্রাম থেকে ভেসে এল কীর্তনের কলি আর খোলের বাজনা। হজু নরসুন্দরের গলাটা স্পষ্ট বোঝা গেল। বাবুর বাড়ির সামনে হয়ে দলটা সদেগাপপাড়া ঢুকেছে।

হরিমতীর স্মৃতি এল ব্যাপিয়ে। এই উঠোনে কতটা রাত অন্ধ এই ধম্মনামে কিংকর বোরের গী কেতনের আসর বসাত। হরিমতীর দাওয়ায় তখন কত মেয়ের ভিড়। গিন্নীর মতো হরিমতীর তখন চলন-বলন। বাঙিল বাঙিল নিড়ি তার আচলে। যে চাইছে, বিলি করছে। কোনো কোনো রাতে জিরেনের সময় বেন্দার বাবা হরিবলা ‘রস’ গাইত কবিয়ালের ঢঙে। ...‘রা-বে-লো তোর ভাঁড়ার ঘরে বেড়াল ঢুকেছে—এ—এ—এ.....’

দই খেয়েছে ভাঁড় ভেঙেছে—এ—এ—এ.....

কালো বেড়াল ধরবে কে—এ—এ—এ.....

হরিবোলা ছিল সাদাসিধে গোবেচারা মানুষ। বোঝাই যেত না তার পেটে পেটে এত রস। বেন্দার মতোই রোগাটে গড়ন ছিল। অমনি টানা চোখ, সরু খাড়া নাক। ভুলেও নিরিবিলা হাত ধরতে আসেনি হরিমতীর। ধরলে হরিমতীর আপত্তি হত কি? হয়তো হত না। হরিমতী জানত, সে বাঁজা মেয়ে। তার ভয়ডর ছিল না। কিন্তু তাই বলে হরিমতী বেশ্যা না। ভগবান আছে মাথার ওপর, সে জানে—হরিমতী খানকি মেয়ে না। খানকি হলে হরিমতীর কি এ

বয়সে ভাত কাপড়ের অভাব হত ? মনে যাকে ধরেছে, তার কাছে যেতে হরিমতীর আপত্তি হত না—এই যা। তার জন্তে হরিমতীকে বেবুশে খানকি বললে হরিমতী তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে।

পুরনো কথা ভাবলে আজকাল হরিমতীর কান্না আসে। হায়, যে হরিমতীর বুকের পাটা ছিল কিংকর বোরেরীকে বাড়ী এলে ঠাই দেওয়ার, সেই হরিমতী যায় মনের আলা জুড়োতে নদী পেরিয়ে যুদ্ধের কুঁড়েঘরে ? সে দিনকাল সে বয়স থাকলে যুদ্ধে তার বাড়িতেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকত।

এইসব ভাবতে গিয়ে হরিমতীর মাথায় ভেসে এল বেন্দার কথা। অমনি লজ্জায় কঁকড়ে গেল। আ ছি ছি। পেটের ছেলেটা। মাসি বলে ডাকে।

বেন্দা এল যখন, তখন হরিমতী দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়েছে। খুঁড়খুঁড় করে উঠে বলল, পেলি ?

হুঁও। পান্তর বের করো। একখানা ত্যাকড়া দাও—ছাঁকনি করি। ডেঁয়ো পিঁপড়েতে ভর্তি।

হরিমতী বলল, আমার আঁচল জড়িয়ে নে হাঁড়ির মুখে। পোস্কের কাপড়। আর লম্ফ নিয়ে খুরি চুঁড়ে আন ভেতর থেকে।

কাপড় কতটা 'পোস্কের', তা টের পাচ্ছে বেন্দা। কিন্তু আর হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ নেই। লম্ফ হাতে হরিমতীর ঘরে ঢুকে সে চঞ্চল দৃষ্টি বুলোতে থাকে এদিকে-ওদিকে। ঘরে তেমন কিছু নেই, যাতে চোখে পড়ে। মাটির ডেয়োচাকনা কিছু, দুটো ছেঁড়া শাড়ি, একটা শায়াও আছে বটে। আর একটা কাঠের বড় বাকসো। কী আছে ওতে ? তেমন কিছু থাকলে কি হরিমতীর না খেয়ে দিন কাটত ?

একটু লজ্জা পেল বেন্দা। আজকাল শালা কী এক দৃষ্টি হয়েছে চোখের, মনের হয়েছে কী এক ছোঁক-ছোকানি। হরিমতী এখন তার আপনজন।

লম্ফ নিবিয়ে ছুঁজনে ভাগ করে খেল তাড়িটা। ছুঁখুরি করে ভাগে

পড়ল। শেষ খুরিটা হরিমতী বলল ভাগাভাগি খেতে। আগে খেল বেন্দা, শেষে হরিমতী। তারপর হরিমতী হাসতে হাসতে বলল, এঁটো খাওয়ালি বেন্দা।

বেন্দা বলল, জানলে আরেকটা সিগারেট কিনতুম। আমার আজ পয়সার অভাব নেই বোঁধুনীমাসি।

সে বাবুর বাঁশবনের বৃত্তান্তটা আগাগোড়া শোনাল। হরিমতী থি থি করে খুব হাসল। তারপর বলল, কাল তাহলে আমরা ভাত খাই, কী বলিস বেন্দা ?

খাব। ভাতের জন্তে আমারও মনটা হু হু করছে।

ও বেন্দা, তোর ভাত আর আমার মাংস।

মাংস ? কোথায় পাবে মাংস ?

হরিমতী আবেগে বেন্দার কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, কুঁড়পুকুরে হাঁসগুলো চরতে চরতে কেলান্ত হলে পাড়ে উঠে বিমোয়। বাঁশবনের ভেতর কঞ্চি হাতে করে বসে থাকব। তারপরে মারব মাথায় পট করে এক বাড়ি...থি থি থি থি....

হাসতে হাসতে সেখানেই লুটোল হরিমতী। বেন্দা তারিফ করে বলল, তোমার বুদ্ধি খুব ভাল। তা এবারে শুই। বলে মুণ্ডু ঝুঁকিয়ে চাঁদের অবস্থান দেখে নিল।

শো। এখানেই শো। বলে হরিমতী একটু সরে তাল্লাইয়ে জায়গা দিল।

বেন্দা শুয়ে বলল, আমার শরীরে কেরাচিন মালিশ করে দেবে বলেছিলে যে ?

অ। তা শো। দিচ্ছি।...সে উঠে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে লাগল। তারপর টেঁচিয়ে বলল, দেখছ ? দোর আটকানো নেই। সে নিভে থাকা লম্প টুঁড়ে দরজায় আগের মতো তাল্লা এঁটে বেন্দার পাশে বসল।

বেন্দা বলল, তোমার ঘরে নেবেটা কী চোরে ?

হরিমতী লম্পের সলতের তেল হাতে মাখতে মাখতে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিকই বলেছিস বেন্দা। কই, উপুড় হ, দেখি।

উরু থেকে পায়ের পাতা মালিশের ভংগিতে টিপে দিচ্ছিল হরিমতী। কখনও বাচ্চাছেলের মতো হেসে উঠছিল বেন্দা—মাইরি! কাতুকুতু লাগছে! কখনও ককিয়ে উঠছিল—উছ হ! ব্যাথা, ব্যাথা। উঠোনে সাদা জ্যোৎস্না। বাবুর বাগানের গাছে-ঝোপে গ্রীষ্মরাতের উদ্দাম বাতাসের শনশনানি। কীর্তনের দলটা কখন যে-যার বাড়ি ফিরে কাঠ হয়ে য়ুমোচ্ছে। তারপর নদীর ওপারে দূরে শেয়াল ডাকল। ঢুলতে ঢুলতে হরিমতী গায়ে পড়ল। বেন্দা য়ুমোয় নি। য়ুরে চিত হয়ে গুল। তার মাথায় আকাশ-পাতাল ভাবনা। তার ভালোগুলো মন্দ এবং মন্দগুলো ভালো হয়ে যাচ্ছে। দুবার সে সাবধানে হাত বাড়িয়ে ছুল হরিমতীকে। তৃতীয়বার ডান হাত থেকে শ্রাকড়ার পট্টিগুলো খুলে ফেলল। তারপর মাথা তুলে দেখল বুকের অঙ্কেকটা উদ্যম হয়ে আছে হরিমতীর। বুকটা ছুঁয়ে বেন্দার বুক হাতুড়ি পড়তে থাকল। সে একটু চাপ দিল। তবু জাগল না হরিমতী। হরিমতী তার কে?

সাহস্ করে বেন্দা হরিমতীকে কাছে টানতে লাগল। কিন্তু হরিমতীর যেন মরণ য়ুম্। কোন সাড়া নেই।...

দু'টাকায় কেনা মজা

কমলাক্ষ বললেন, ও অল্প! তোর বোনপোর কাঁতি দেখে আয় গে বোষ্টুমীর বাড়ি।

অল্প কোমরে আঁচল জড়িয়ে কলতলায় থালা মাজছিল! মুখ না-বুরিয়েই বলল, আমি কী দেখব? আপনারাই দেখুন।

কমলা বারান্দায় থামের কাছে হাত পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজ হাওয়া-বাতাস বন্ধ। গাছ গাছালি আর আকাশ থমথম করছে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। বললেন, কী রে অল্প?

বাবুকেই জিজ্ঞেস করুন না! অল্প বাঁকা মুখে জবাব দিল।

কমলাক্ষ চোখ নাড়িয়ে বললেন, হরিমতী বোষ্টুমী নতুন মানুষ
তুলেছে ঘরে।

কমলা বাঁকাঠোটে গলা চেপে বললেন, ও। তাতে তোমার বড়
অসুবিধে হচ্ছে বুঝি ?

জিভ কেটে কমলাক্ষ বেরিয়ে গেলেন দ্রুত। মাঠে তিলক্ষেতে
নিড়ান দিচ্ছে মুনিশেরা। আউস আর পাটের চারা শুকিয়ে যাচ্ছিল।
টিউবেল থেকে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু পাতাল জলের গতিক
ভাল না। পৃথিবীর ভেতরটা খরায় শুকিয়ে যাচ্ছে। ডোমন মোড়লের
ছেলে সুখেন মধুপুর স্কুলের মাস্টার। সে এখন সহকারী অঞ্চল প্রধান।
মাঠের ওপর দিয়ে বিদ্যাতর যে লাইন গেছে, সেখান থেকে ট্রান্সফর্মার
বসিয়ে বিদ্যাতর সাহায্যে ডিপটিউবেল এবং নদীতে বাঁধ দিয়ে
ইরিগেশন পাম্পিং স্টেশনের জন্ম সে ছোট্টাছুটি করে বেড়াচ্ছে।
কমলাক্ষ সুখেনের ভরশায় দিন গুনছেন।

বাবু বেরুলে অন্ন কাঁদো-কাঁদোমুখে বলল, ও বাবুদিদি! রাক্ষুসী
মাগীর হাত থেকে আমার বেন্দাকে রক্ষা করুন !

ভুরু কঁচকে কমলা বললেন, বেন্দা জুটেছে বুঝি বোষ্টুমীর কাছে ?

হ্যাঁ বাবুদিদি ! অন্ন নোংরা হাতের উল্টো পিঠে নাক মুছে বলল।
এ্যাদ্দিনে জানলুম, কে অমন ভাল ছেলেটাকে তলায় তলায় ফাঁসলানি
দিয়ে মন্দ করেছে। বেন্দার কখনো চোর-চোদ্দামী ছিল না। বলুন,
ছিল ? আপনাদের বাড়িতে সেই এ্যাটুকুন থেকে মানুষ।

কমলা উদাস হয়ে বললেন, তা আমি কী করব ? তারপর ঘরের
দিকে ঘুরে ডাকলেন, মঞ্জুরে !

পূর্বা ও মঞ্জু লুডো খেলছিল ঘরের ভেতর। দক্ষিণ-পূবের এই ঘরে
হাওয়া খেলে সারাক্ষণ। নিচেই পুকুর। কিন্তু আজ বড় গুমোট
চলেছে সকাল থেকে। পূর্বা হাঁকিয়ে উঠেছে। কলকাতায় প্রচণ্ড
লোডশেডিংয়ে পাখা ঘোরে না বটে, এত বেশি গরম লাগে না। কাল
ভোরের বাসে চলে যাবার কথা বলেছে সে। মঞ্জু বলেছে, যাওয়াচ্ছি।

এলেই খালি যাব-যাব। পূর্বা বলতে পারে না, তার রাত কাটানো কী কঠিন। একেবারে ঘুম হয় না গরমে।

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে মঞ্জু বলল, কী মা ?

কমলা বললেন, পূর্বাকে নিয়ে একবার দেখতো গণশাকে। কখন মাছ ধরবে, রান্নাবাড়াই বা হবে কখন ?

অনিচ্ছাসত্ত্বে মঞ্জু বেরুল। পূর্বা বলল, কতদূরে যাবে ?

কাছেই। বলে মঞ্জু পূর্বার গলা জড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়ার ভংগি করল। তার চাপে পূর্বা কাত হয়ে টাল খাচ্ছিল। সামলে নিল।

বলল, খুব জোর হয়েছে তো তোমার গায়ে।

মঞ্জু ফাজলেমির সুরে বলল, হবে না ? এতো তোমাদের কলকাতার পচা মাছ থেকেও শরীর না। তুমি এখানে থাকলে তোমারও এমনি হত।

পেছনে অন্ন তখনও কান্নাকাটি করে বসছে ! রাফুসী ! রাফুসী ! পেটের ছেলেটা—মা-মাসি করে ডাকে। তাকে নিয়ে শুতে তোর সজ্জা হল না। ষিক্ ষিক্ ! শত ষিক্ বেবুণ্ডে। ছেনাল !

কমলার ধনক খেয়ে সে চুপ করে গেল। রাত্তায় নেমে পূর্বা বলল, কী হয়েছে মঞ্জু ? মঞ্জু ফিস ফিস করে বলল, সেই বোঠুনীকে দেখলে না নদীর ওপারে ? আর বেন্দাকে তো দেখলে বাঁশ চুরি করতে। ওদের কথা বলছে।

ব্যাপারটা কী ?

প্রশ্ন শুনে মঞ্জু হেসে ফেলল। বুঝতে পারছনা এখনও ? কলকাতায় থেকে-থেকে তোমার মাথার ঘিলু টেসে গেছে পূর্বাদি ! বোঠুনী আর বেন্দাশালা ...

বলে আদুলে আদুল হাঁকড়ে মঞ্জু যে ভংগিটা করল, পূর্বার চোখে সেটা দস্তুর মতো অগ্নীল। সে মঞ্জুর পিঠে কিল মেরে বলল, অসভ্য মেয়ে কোথাকার !

মঞ্জু হাসতে হাসতে একটু সরে গেল। পূর্বার এখানে একটুও

ভাল লাগছে না। কলকাতায় থাকতে হঠাৎ-হঠাৎ এ গ্রাম, তাদের বাড়ি, অনেক অস্পষ্ট দৃশ্য ও ঘটনার স্মৃতি তার মাথায় ভেসে আসে। কিন্তু কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। এবার এই দারুণ গ্রীষ্মে এখানে আসার ইচ্ছে তার একটুও ছিল না। বাবার কথাই আসতে হল। বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ভাল থাকলে রথ দেখা কলা বেচার মতো জন্মভূমিতে বেড়াতে আসা এবং কমলাফের কাছে পাওনা টাকা যতটা পারা যায় আদায় করার আনন্দ লুণ্ঠনেন। পূর্বাকে পাঠিয়েছেন চিঠি লিখে। টাকার জরুরী দরকার। কিন্তু কমলাফ একেবারে চুপ করে আছেন! পূর্বার পক্ষে মুখ ফুটে তাগিদ দেওয়া অসম্ভব। কেনই বা দেবে? বাবার চিঠিটাই যথেষ্ট।

ঘোরালো মাটির রাস্তা খটখটে শুকনো। মধ্যখানে গরম ধুলো। কিনারায় গাছ-গাছালির ছায়া, ঘরবাড়ির ছায়া। সেই ছায়ায় ছুটিতে হাঁটতে বাঁদিকে অংগাহার ভেতর পায়চলী পথ ধরে এগিয়ে মঞ্জু বলল, গণশাকে বলে বোষ্টুমীর বাড়ী যাবে পূর্বাদি?

পূর্বা অবাক হয়ে বলল, কেন?

চলো না! বেন্দা আর বোষ্টুমীকে দেখে আসব।

সে কী!

মঞ্জু চাপা হাসছিল। হাসিটা পূর্বার কাছে বেজায় অগ্নীল। গ্রাম সম্পর্কে তার ধারণা বরাবর ভাল নয়। মঞ্জুকে এবার এসে যতটা ভাল ভেবেছিল, মঞ্জুও যেন ততটা ভাল নয়। পূর্বার মতে, সেক্সটেন্স নিয়ে কথা বলা দোষের কিছু নয়—কিন্তু সেক্স-বিষয়ক কথাবার্তার ভংগিটাই আসল কথা। মঞ্জুর ভংগী—অর্থাৎ এক্সপ্রেশনটাই অগ্নীল মনে মনে বিরক্ত হয়ে পরে পূর্বা ভাবল, আসলে মেয়েটা তত লেখাপড়া শেখেনি এবং গ্রামে পড়ে আছে। তাই এক্সপ্রেশন এমন অমার্জিত।

মঞ্জু বলল, তুমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি পাঁচিলের ফাঁকে উকি মেরে দেখে আসব ওরা কী করছে।

পূর্বা অনিচ্ছায় হেসে বলল, তুমি ভীষণ পেকে গেছ মঞ্জু! হিঃ।

হিঃ কিসের? মঞ্জু চঞ্চল চোখে তাকিয়ে বলল। আর পেকেছি

তো পেকেছি। পাকবনা? আমি কি তেমন কচি খুকি হয়ে আছি
আগের মতো যে গাল টিপলে ছুঁ বেরুবে?

গণেশের বাড়ি উঁচু ভিটের ওপর। একদিকে গভীর শুকনো খাল।
বাঁশের সাকো আছে খালে। গণেশের বউ একটা মাটির তেলো হাতে
নিয়ে সাকো পেরুচ্ছিল। কোলে বাচ্চা। বলল, বাবু দিদি যে।

মঞ্জু তার মায়ের ভংগিতে বলল, তোমার বর কী ভেবেছে বলো তো
বউ? কখন জাল নিয়ে যাবার কথা।

গণেশের বউ বলল, গেছে তো। কোন্ বাগে এলেন আপনারা?
দেখা হল না পথে?

মঞ্জু বলল, না।

গেছে। এই তো আমিও যাচ্ছি।

গণেশ খেয়াজাল নিয়ে জলে নামলে তার বউ সামনের দিক থেকে
সাতার কেটে জল নাড়তে নাড়তে আসবে। তখন জাল তুলে ধরবে
গণেশ। ছুঁথানা বাকানো বাঁশে বাধা জালে মাছ ঝকঝক করবে।
বাচ্চাটা পাড়ে আপন মনে খেলা করবে গাছের ছায়ায়।

বাগদীপাড়া নিঃস্বুম হয়ে যাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে নিচু 'জোজ' জমি
পেরিয়ে ভুজনে গাছপালা ঢাকা জঙ্গলে জায়গায় পৌঁছল। এখানে
ভাঙাচোরা একটা শিব মন্দির আছে। গাজনের সময় চৈত্র সংক্রান্তিতে
যা একটা দিন পূজা আর পাঁঠাবলি হয়। এবারকার গাজনে কাটা
পাঁঠা পড়েছে, সেইসব গল্প করতে করতে মঞ্জু হঠাৎ নাক উঁচু করে
বলল, দারুণ গন্ধটা না?

পূর্বা বলল, কিসের বলো তো?

ওই যে কাঠমল্লিকার। আমাদের বাগানের। আঙুল দিয়ে দেখাল
মঞ্জু। ফের বলল, ওখানেই তো বোষ্টুমী থাকে।

পূর্বা আনমনে বলল, হুঁ। জানি।

বাবা বোষ্টুমীকে তাড়িয়ে দেবেন, জানো?

সে কী। কেন?

ওখানে ধান চাষ হবে।

পূর্বা অবাক হয়ে বলল, ‘বাবুর বাগান’ এটাই তো ?

হ্যাঁ। মঞ্জু হাসল। কোন বাবুর ভেবেছ তুমি ? আমার ঠাকুরদার নামে নাম। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও পূর্বা দি। আমি উকি মেরে দেখে আসি।

মঞ্জু দৌড়ে খেঁকশেয়ালের মতো অথবা খরগোসের মতো চলে গেল। শুকনো পাতায় খুব শব্দ হল। তারপর স্তব্ধতা। বাতাস বইছে না। কিন্তু কাঠমল্লিকার মিঠে গন্ধে চারপাশ মম করছে। হঠাৎ পূর্বার মনে পড়ে গেল সবুজ সাপটার কথা। তখন ভয়ে-ভয়ে সরে গিয়ে শিবমন্দিরের সামনে ছায়াঢাকা চটানে দাঁড়াল। তারপর দেখল মঞ্জু কাঠমল্লিকা গাছটার নীচে নীচু পাঁচিলের একটা ভাঙা জায়গার সামনে হাঁটু হুমড়ে বসে আছে। বারবার হাসিমুখে পূর্বার দিকেও ঘুরছে। কী দেখছে মঞ্জু ? অগ্নীল কিছু কি ? পূর্বা টের পেল, তার মনেও আবছা একটা ভয়-লজ্জা মাখা কৌতূহল হুড়হুড়ি দিচ্ছে। মঞ্জু ঘুরে হাতছানি দিয়ে ডাকলে সে আর স্থির থাকতে পারল না। মঞ্জুর কাছে চলে গেল।

মঞ্জু ফিস ফিস করে বলল, বোষ্টুমী চুল খুলে বসে আছে। আর বেন্দা উকুন তুলে দিচ্ছে,—নাকি পাকা চুল। বোকা যাচ্ছে না। দেখ না, কী মজা।

পূর্বা উকি দিল ফাটল দিয়ে। দাওয়ায় ছুপা সামনে ছড়িয়ে বসে আছে হরিমতী। তার পিঠের কাছে বসে তার চুল ঘাঁড়ছে সেই বেন্দা। চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে ওরা। কিন্তু বোকা যাচ্ছে না কী কথা বলছে।

পূর্বা খারাপ কিছু দেখবে ভেবেছিল। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। ভ্যাট্। কোনো মানে হয় ? সঙ্গে সঙ্গে হরিমতী তাকে দেখতে পেয়ে বলল, কে গো ?

মঞ্জু অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বোষ্টুমীকাকী, আমরা !

হরিমতী ধুড়মুড় করে উঠে এগিয়ে এল। হাসিমুখে বলল, ভেতরে

এস। আদাড়ে কেন বাছা? ফুল কুড়োচ্ছি বোষ্টুমী কাকী। মঞ্জু গম্ভীর মুখে বলল।

হরিমতী হাসতে লাগল।.....বাবুর মেয়ের এখনও সেই স্বভাব। ফুল কুড়োচ্ছে। ভেতরে এস। পোস্কের জায়গায় এই দেখ না—কত ফুল! আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি। এস।

কাঁক গলিয়ে মঞ্জু সহজে ভেতরে চলে গেল। পূর্বর পক্ষে এটা কঠিন কাজ। মঞ্জু তার হাত ধরে অনেক টানাটানি করে ভেতরে নিয়ে গেল। ফুলের গালিচা যেন জায়গাটা। হরিমতী বলল, দাওয়ায় গিয়ে বসো মা তোমরা। আমি কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

দাওয়া থেকে বেন্দা তখন সাঁৎ করে ঘরে ঢুকে গেছে। মঞ্জু গিয়েই ডাকল, এ্যাই বেন্দাশালা! বেরো। বেন্দা ভেতর থেকে আস্তে সাড়া দিয়ে বলল, কী?

তুই এখানে জুটেছিস যে?

পূর্বা ঘরের সামনে গিয়েই শিহিয়ে আমগাহটার তলায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সে বাপারটা উপভোগ করছে।

বেন্দা বেরিয়ে লাজুক হেসে বলল, মাসি তাড়িয়ে দিলে তো কী করব? অকৃত রেতের বেলা একটা শোবার জায়গা তো চাই মানুষের। বোষ্টুমী বললে, আমার কেউ নেই। তুই থাক আমার কাছে। থাকনুম।

হুঁউ। মঞ্জু দাওয়ার খুটিতে হেলান দিয়ে মুখ টিপে হাসল। বুঝতে পারছি বেন্দা, এবার তুই বোষ্টুমী কাকীকেও পুলিশের ঠেঙানি খাওয়াবি।

বেন্দা প্রতিবাদ করল।... না না। বোষ্টুমী কী করেছে যে ওকে মারবে?

তারপর সে দাওয়া থেকে নেমে আমগাহটার তলায় গিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, ও কলকাতার দিদি! ছোটো টাকা চেয়েছিলুম। দেন না দয়া করে!

পূর্বা কী বলতে যাচ্ছিল, মঞ্জু এসে থাপ্পড় তুলে বলল, চোপ্

শালা! মুখ ভেঙে দেব। কোন মুখে টাকা চাইছিস আর? ওদিন যে বাঁশখানা কাটলি, ওতেই হয়ে গেছে।

হরিমতী কাঠমল্লিকা ফুল কুড়োতে-কুড়োতে বলল, বেন্দা! উ কি স্বভাব বাপু তোর? চাইবি যদি, মধুপুরের বাজারে গিয়ে বস। এখানে জায়গা হবে না বলে দিচ্ছি।

বেন্দা বলল, তুমি থানো তো! কলকাতার দিদির কাছে আবার করে চাইছি। ছোটবেলায় ওনাকে একদিন কোলে করে কাদারাস্তা পার করে দিয়েছিলুম না?

মঞ্জু বলল, মিথ্যা কথা।

পূর্বা বলল, না। সত্যি। আমার মনে পড়ছে।

বেন্দা বলল, আর মঞ্জুদি—তুমিও বলো, কী না করেছি তোমার জুতো? পাখির ছানা পাড়তে যেই গাছের গর্তে হাত ভরতে যাচ্ছি, উরে বাস! কালসাপ ফোস করে উঠেছে। মনে পড়ছে!

মঞ্জু বলল, পড়ছে না।

বেন্দা চোখ বড় করে বলল, দোহালির বিলে তোমার জুতো পদ্মফুল তুলতে গিয়ে ডুবে মরছিলুম, মনে পড়ছে না?

না।

বেন্দা অভিমান দেখিয়ে বলল, তা মনে পড়বে কেন? বড় বরের মেয়ে তুমি। মন খুব বড় কিনা। গরীব ঘরের ছেলের সব মনে আছে।

বলে সে ফাঁচ করে হাসল। চাপা গলায় বলল ফের, ও মঞ্জুদিদি! ‘পান্মিশেন’ দাও—আরেকখানা বাঁশ কাটি। ছোট দেখে। বড় না—ছোট বাঁশ।

পূর্বা হাসছিল ওর কথা শুনে। মঞ্জু বার কতক চোপ বলার পর হরিমতীকে বলল, বোষ্টুমীকারী! বেন্দাকে সামলাও। বাঁশ কাটবে বলছে আবার। এবার কিন্তু বাবার কানে তুলে দেব।

পূর্বা বলল, ‘পান্মিশেন’ চাইছে মঞ্জু! বুঝতে পারলে? পারমিশান! ও বেন্দা, জানো কথাটার মানে কী?

বেন্দা একগাল হাসল। বাবুরা বলেন: শুনে শিখেছি।

হরিমতী উঠে এসে বলল; কৈ আঁচল পাভো।

অনেক ফুল কুড়িয়েছে হরিমতী। মঞ্জু একসময় ঠাকুর পুজোর ফুল এখান থেকেই নিয়ে যেত। পুজোর ফুল আর ফোটে না বাবুর বাগানে। মঞ্জুর মায়ের পুজোর ফুল খিড়কির পুকুরপাড়ে অঁচল ফোটে। না ফুটলেও কমলারানী হরিমতীর বাড়ির ফুলে পুজো করতেন না।

আঁচলে ফুল নিল মঞ্জু। পূর্বা বলল, মঞ্জু! পাতাসুন্ধু কয়েকটা থোকা পাড়তে বলো না!

বেন্দা শোনামাত্র চলে গেল। গাছে উঠে চারটে ভেঙে তক্ষুনি এনে দিল। হরিমতী বলল, ও মঞ্জু! তোমার বাবা উচ্ছেদ করতে চাইছেন, জানো?

মঞ্জু একটু হাসল। তারপর চাপা গলায় বলল, সুখেনদাকে গিয়ে বলো না বোষ্টুমৌকাকী। সুখেনদাকে বাবা ঠেলতে পারবেন না।

তারপর সে পূর্বীর হাত ধরে টেনে হনহন করে চলতে থাকল। পূর্বা পাতাসুন্ধু থোকাগুলো নিয়েছে। পেছন পেছন বেছা এগিয়ে বলল, কখন যাব কলকাতার দিদি? এক্ষুনি যাঠি?

মঞ্জু ঘুরে শাসাল। এক পয়সাও পাসি নে বাঁশেই শোধ।

শিব মন্দির পর্যন্ত এসে বেন্দা ক্ষান্ত হল। দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত রেখে বড়বাবুর কলকাতার নেয়েটার ওপর তার খুব রাগ হয়েছে ফুলের থোকা টাটকা পেড়ে দিল! তবু সুখ ফুটে বলল কি অমৃতত একটা টাকাও দেবে? ঠিক আছে। আমার নাম বেন্দা।

কিন্তু পূর্বীর দ্বিধা মঞ্জুর জন্ত।

বিকলে পূর্বা সেই দক্ষিণ পূর্বকোণের ঘরে জানলার পাশে চেয়ারে বসে সঙ্গে আনা একটা উপহাস পড়ছে। মঞ্জু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। চোখের কোনা দিয়ে পূর্বা দেখল, জানলার বাইরে কেউ এসে দাঁড়াল। ঘুরতেই বেন্দার চোখে চোখ পড়ল। মঞ্জুর দিকে

ইসারা করে চোখ টিপে সে হাত পাতল।

হাসিতে গা ঘুলোচ্ছে পূর্বার। কিন্তু হাসতে পারল না। আহা, বেচারাকে ছুটো টাকা দিলেই ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু মঞ্জুর চোখ এড়ানো কঠিন হবে।

পূর্বা বলল, মঞ্জু! দেখ না চায়ের জল চড়িয়েছেন নাকি কাকিমা। ভীষণ চায়ের তেষ্ঠা হয়েছে।

মঞ্জু আনমনে 'যাই' বলে চিরুনী হাতে বেরিয়ে গেল। পূর্বা টেবিলের ওপর থেকে তার ব্যাগটা নিয়ে ঝটপট একটা ছুটাকার নোট বের করে জানলায় গিয়ে বলল, নাও। চুপচাপ কেটে পড়ো।

বেন্দা তক্ষুনি খিড়কির দিকের কলাবনে উধাও হয়ে গেল।

মঞ্জু ফিরে এসে দেখে, পূর্বা আপনমনে হাসছে। বলল, চা হচ্ছে। তুমি হাসছ কেন পূর্বাদি?

পূর্বা বলল। এই বইটায় একটা মজার ব্যাপার পড়ছি। তারপর সে প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়ল।—

মুজফ্ফর ডাকু

সারাদিন থমথমে আবহাওয়ার পর কালবোশেখির আশা ছিল। এল অনেক দেরিতে। মধ্যরাতে। প্রথমে ধুলোর ঝড়, তারপর মেঘের ডাক নিয়ে দ্বর্ধ্ব বৃষ্টি। অজু নাপিতের কেতনের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে-যার বাড়ি চুকে পড়ল। কত গাছের ডাল ভাঙল। কুনাইপাড়া-বাগদীপাড়ার ঘরের চাল উপড়ে গেল কয়েকটা। ঝড় কমেছে যখন, তখন সেদিক থেকে বৃষ্টির মধ্যে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

বেন্দা ও হরিমতী ছরুছুরু বুকে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মাসের গোড়ায় যুধিষ্ঠির প্রেমের বশে হরিমতীর ঘরের চাল মেরামত করে দিয়েছিল। তাই বাঁচোয়া।

ঝড় থামলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল আম কুড়োতে। ঘরের ভেতর শুয়েছিল ছুটিতে। দাওয়া জলের ছাঁটে কাদা হয়ে গেছে। হরিমতী দরজা খুলে রেখেছে। মেঘ ডাকছে বারবার। বিছাত ঝিলিক দিচ্ছে। রাতকানা হরিমতী এ ঝিলিক টের পাচ্ছে। তার খালি ভয় হচ্ছে, বেন্দার ওপর বাজ পড়বে না তো? এই চোর চোড়া ছোঁড়াটা এ বয়সে তার বুদ্ধিসুদ্ধি খুলিয়ে দিয়েছে। লোকের গঞ্জনার ধার কোনোকালে ধারে না হরিমতী। সে জানে, সে যদি মারা পড়ে, তার মড়া ফেলতে বাবুই শহর থেকে নিজের খরচায় ডোম আনবে। সেবার বানের জলে কিংকর বোরোগীর মড়া আটকেছিল দোহালির বিলে। সেখানেই শেয়াল শকুনে খেয়ে শেষ করছিল। মাথার খুলিটা নাকি অমর্ত কুড়িয়ে এনে বেগুনক্ষেতে বাঁশের ডগায় বসিয়ে রেখেছিল। হরিমতী বিশ্বাস করেনি। খুলি সব মানুষেরই একরকম। তবে গোবিন্দের মড়া গঙ্গা পেয়েছিল। কমলাক্ষের বাবা নলিনাক্ষ বড় ভালবাসতেন গোবিন্দকে।

একটু আগে হরিমতী বেন্দার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছিল। আদরের বুলিগুলো অন্তের কাছে অগ্নীল মনে হবে। কিন্তু হরিমতীর জীবনে কত খাঁটি কথা ওগুলো। এ বয়সে খাওয়া-পরার কষ্ট, একলা থাকার কষ্টটাও বড় সাংঘাতিক—হরিমতীর এই দ্রব। বেন্দা রোজগারে না হলেও পুরুষমানুষ তো বটে। সঙ্গে আছে। কথাবার্তা বলছে। ভুল করে মাসি ডাকতে গিয়ে জিভ কাটছে। আবার হরিমতীর বেলাতেও তাই। বাবা-বাছা করতে গিয়ে সেও লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে। এগুলো ক্রমে ক্রমে সয়ে যাবে। পরম্পর দ্রজাতি নয়, রক্তের সম্পর্ক তো নেই-ই—তাহলে আর বাধাটা কিসের? সবাই জানে হরিমতী এরকম।

কিন্তু থাকবে তো বেন্দা? যতদিন না হরিমতীর মরণ হচ্ছে। এমনি করে থাকবে তো সঙ্গে? ঝড়জলের রাতে তালাইয়ে শুয়ে এই ভাবনাটা হরিমতীকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। বাবু যদি তাকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়েও দেয়, বেন্দা পাশে থাকলে হরিমতীর ভয় নেই। কেউ জানে

না, আমগাছটার তলায় শীতের সময় যে উল্লুন জ্বলে, তার গাভখানেক দূরে শিয়রের দিকে মাটির তলায় ছোট্ট একটা কাঠের বাকসো পোতা আছে। বাকসের মধ্যে শক্ত টিনের কোঁটোর মধ্যে খানকতক সোনারূপোর গয়না আছে। উপোস করে থাকে পেটে কাপড় বেঁধে, তবু ওতে হাত দেয় না হরিমতী। ভাবে কোনো এক চরম সংকটের দিনে বাকসোটা নিশিরাতে তুলবে। কিন্তু কী সে সংকট, কেমন করে আসবে তার জীবনে, হরিমতী জানে না। ক্ষিধেয় নাড়ি জ্বলতে জ্বলতে কতবার গোবিন্দ মালীর খুরপিটা হাতে নিয়েছে, আবার রেখে দিয়েছে। টলতে-টলতে গেছে এবাড়ি ওবাড়ি দুমুঠো চাল ধার করতে। শোধ দেয় বলে ধার পেয়েছে। আর নিদেন ওই নদীপায়রের যুধিষ্ঠির তো আছেই।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে রা-বাকি বন্ধ। বেন্দাকে নিয়েছে বলে যুধিষ্ঠির দূর থেকে দেখলে মুখ নামায়। এখন ভাবনা, বেন্দা তাকে ছেড়ে না পালায়। বেন্দা গেলে আর কাকে পাবে হরিমতী? তেমন কাকেও আনাচে-কানাচে দেখতে পাচ্ছে না। তাছাড়া তার বয়সও হয়েছে। চেহারা য আগের ঝিলিক নেই। তারসঙ্গে জুটেছে রাত কানা রোগটা। পছন্দসই আর কোনো পুরুষ তার দিকে তাকাতে নেই এতবড় পৃথিবীটাতে!

ফৌস করে নিঃশ্বাস ফেলে হরিমতী ঠিক করল, ভালয়-ভালয় যিরে আশুক বেন্দা। তারপর একথা সে-কথা বলে বাজিয়ে দেখে নেবে বেন্দার মন। তারপর বলবে গোপন কথাটা।

হু, বলবে। কিন্তু কোথায় লুকোনো আছে, তা বলবেনা। বলবে, আমার কিছু সোনারূপো আছে। বেচে চল বেন্দা, কোথাও চলে যাই। বরঞ্চ, চল না কুনাইপাড়ার কাজলের মতো কলকাতায়!

রক্ত নেচে উঠল হরিমতীর। কলকাতার মেয়েটাকে বললে হয়, যেখানে থাকে, সেখানকার কী অবস্থা। কারুর বাড়ি খিগিরি করবে হরিমতী, বেন্দা করবে চাকরের কাজ। বড়বাবু মনমোহনের খবর হরিমতী রাখে। যত বড়াই করুক, বাবু গিল্লির কাছে শুনেছে, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বড়বাবু সর্বশাস্ত। এখনও ছোট্ট মেয়ে গলায় কুলছে।

দাওয়ায় একটা শব্দ হল। তারপর কেউ ঢুকল ঘরে। রাত কানা
হলেও হরিমতী টের পেয়ে বলল, বেন্দা, আমি পেলি নাকি রে ?

বেন্দার বদলে অণ্ড কেউ গলার ভেতর বলল, আমি বোষ্টুমী,
আমি। চৈঁচিও না।

হরিমতী ধুড়মুড় করে উঠে দেওয়ালের দিকে সরে গেল। গলাটা
তার চেনা লেগেছে। কিন্তু ঠাণ্ড হচ্ছে না। কাঁপা-কাঁপা গলায়
বলল, কে বাপু, এমন করে মেয়েছেলেব ঘরে ঢুকলে ?—সাড়াশব্দ
নেই ?

বোষ্টুমী, আমি মুজফর।

হরিমতী আতংকে কাঠ হয়ে বলল, মুজফর ?

হ্যাঁ। আবার কে ?

কাজটা ভাল হল না তোমার। এমন করে ঘরে ঢুকবে কেন বলো
দিকিনি ?

মুজফর ডাকু টর্চ জ্বালল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, আবার
কাকে জোটালে বোষ্টুমী ? তোমার মাইরি বয়স যাচ্ছে, রঙ যাচ্ছে
না।

হরিমতী চুপ করে থাকল।

দাঁড়াও, জুতো খুলি। তাপরে বসব। মুজফর টর্চ নিভিয়ে কাদামাথা
জুতো দুটো খুলে চৌকাঠের কাছে রাখল। তারপর পা দিয়ে তালাইয়ের
ওপর থেকে বালিশটো ঠেলে সরিয়ে বসল। সিগারেটের প্যাকেট বের
করে বলল ফর, নাও বোষ্টুমী। সিগারেট খাও।

হরিমতী ভয়ে-ভয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, রাতকানা রোগে ধরেছে।
গুজে দাও হাতে।

মুজফর সিগারেট ছেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বলল, খুব বর্ষাচ্ছে।
নাও বোষ্টুমী, আগুন নাও।

হরিমতী প্রাণের দায়ে সিগারেট ঠোঁটে নিল। মুজফর লাইটার
ছেলে ধরিয়ে দিল। তারপর খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, তোমাদের
বিছানা ভিজিয়ে দিলুম। আমার জামাকাপড় ভিজে একাকার হয়েছে।

বোষ্টুমী, তোমার পাশের শালা গেল কোথায় বলো ? ও বোষ্টুমী !

হরিমতী আস্তে বলল, একুণি আসবে। আম কুড়োতে গেছে।

কে সে ? নাম কী ?

বেন্দা।

মুজ্জফর ফের একচোট হাসল। ওরে শালা ! সে তো তোমার পেটের ছেলের বয়সী। তার মাথাটিও খেলে ! ভাল, খুব ভাল।

হরিমতী মনে জ্বলতে জ্বলতে বলল, তুমি বাপু কোথেকে জ্বালাতে এলে রাতহুপুরে ?

মুজ্জফর গলার ভেতর বলল, বিষ্টি ছাড়লে পালাব। বড় বিষ্টিতে ভাবলুম, বোষ্টুমীকে গিয়ে ওঠাই। এসে দেখি, দরজা খোলাই। ভালই হল। বন্ধ থাকলে দাওয়ায় বাস থাকতুম অগত্যা।

হরিমতী সাহস করে বলল, এমন করে যে বেড়াচ্ছ, পুলিশের পাল্লায় পড়লে কী হবে ? জানো ? সেদিন বাঁকা চৌকিদার এসে আমাকে জিগ্যেস করছিল তোমার কথা। আমি তো ভয়ে কাঠ।

মুজ্জফর কান না করে বলল, কিংকর না মলে এখনও বাবুর বাগানে মুজ্জফর কতবার আসত।

হরিমতী ওকে ভয় দেখাতে চায়। তাই ফের বলল, বেন্দাকে সেদিন ধরে নিয়ে গিয়েছিল। খামোকা খুব মারধোর করেছে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে। বলতে পারেনি বলেই তো...

কথার ওপর মুজ্জফর বলল, বেন্দা হারামীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ? ও তো মুগিচোর ! ছাড়ো ! আমার কাছে এসে বসো। আগুনে হাত সঁকি। খুব ভিজ়েছি মাঠে আসতে আসতে।

বলে মুজ্জফর টর্চটা জ্বলে হরিমতীর ওপর ধরে রাখল। হরিমতী ধরধর করে কেঁপে দেয়ালে শেঁটে গেছে। কিংকরের আমলে মুজ্জফর আসাযাওয়া করত বটে, কখনও কুকথা বলে নি। কিংকরের সঙ্গে গাঁজার হিলিম টানত এবং খোঁজখবর নিয়ে বা দিয়ে যেত। কিংকর মাধুকরীতে যেত এ-গাঁ। সে-গাঁ। যেখানে-সেখানে মুজ্জফরের স্মাডাত আছে, তাদের খবর আনত এবং মুজ্জফরের খবর পৌঁছে দিত। কিছু

হাত-লবকা পেত কিংকর বোরগী। শেষে পুলিশের নজরে পড়ে ও লাইন ছাড়ে। সে-বছরই বানের জলে পা হড়কে ভেসে না গেলে কিংকরকে মুজফরের চাকু খেতে হত।

হরিমতীর দিকে হাত বাড়িয়ে মুজফর বলল, অমন কেন করছ বোষ্টুমী। তুমি তো সতীলক্ষ্মী নও—কারুর মস্তুর পড়া বউও নও। এস।

হরিমতী ফাঁচ করে কেঁদে বলল, না। আমি বেবুশো। তারপর কাঁধে মুজফরের থাবা পড়লে সে সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে পা ছুটোকে আঁকসি লাগিয়ে চৌচিয়ে উঠল, ও বেন্দা। বেন্দা রে।

রাগের চোটে মুজফর চড় মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আটকানো দরজা হড়াম করে উঠল এবং বাইরে থেকে শেকল খালার বনবন শব্দও হল। তারপর বন্দার গলা শোনা গেল—থাম্ শালা। বাঁকুদাকে ডাকি।

বলেই রুষ্টির মধ্যে বেন্দা উঠোনে নেমে চিলচৌচানি চৌচাতে শুরু করেছে—বাঁকুদা হে—এ—এ—এ। বাঁকুদা—অ—অ—অ।

চৌকিদারির বাড়ি ‘জাল’ বা নিচু জমিগুলোর ওধারে। শুনতে পাবে কি না, ঠিক নেই। তবু বেন্দা চৌচাতে-চৌচাতে গলা ভেঙ্গে ফেলছিল। এককোচড় আম কুড়িয়েছে। ছুটো নারকেলও পেয়েছে। রুষ্টিতে শিয়ালভেড়া হয়েছে ততক্ষণে। নারকেলছুটো এবং আমগুলো দাওয়ায় পড়ে গেছে। দাওয়ায় উঠেই মুজফরের গলা শুনে কাঠ হয়ে দরজায় কান পেতে ভাবছিল, কী করবে। কিন্তু আর সহ্য করতে পারেনি। নরীয়া হয়ে গেছে।

ভেতরে মুজফর হতভম্ব। তারপর সামলে নিয়ে বলল, দেখ বোষ্টুমী। আমিতো মরেই আছি—কিন্তু তোমার জানটা যাবে। শিগগির তোমার ঢাংনা নেড়ি কুত্তাটাকে ডেকে বলো, দরজার শেকল খুলে দিক। নৈলে...

হরিমতী রাতকানা। কিন্তু পাঁজরে ছোরার ডগা টের পেয়ে সে ভাঙ্গা গলায় চৌচিয়ে বেন্দাকে ডাকতে লাগল।—অ বেন্দা শেকল খুলে

দে, নৈলে আমাকে খুন করে ফেলবে। তোর পায়ে পড়ি বেন্দা, কথা শোন।

বাঁকা চৌকিদার গাঁজা খেয়ে ঘুমোচ্ছে এমন রাতে। বেন্দা জেনেও চেষ্টাচ্ছিল। তাছাড়া মুজফরকে বাঁকা কত ভয় পায়, তা সে জানে। বাঁকার সাধ্য নেই মুজফরকে আটকায়। তবু এই চেষ্টামেচিতে সাহস পাওয়া যায়। এখন হরিমতীর আর্তনাদ শুনে সাহসটুকু চলে গেল। শেকল খুলবে কোন সাহসে? লোকটা ভয়ংকর বাঘ। শেকল খুললেই তো তাকে এক কথায় রক্তারক্তি করে ফেলবে। বেন্দা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হরিমতী আবার ডাকতে লাগল কেঁদেকেটে। ছোরার ডগা তার পাঞ্জরে চেপে রেখেছে। জায়গাটা চিনচিন করছে। শেষে গোড়াতে গোড়াতে বলল, অ বেন্দা আনাকে চাকু বিঁধিয়ে দিয়েছে রে।

সত্যি সত্যি বেঁধায় নি। খামোকা খুনোখুনি করার পক্ষে নয় মুজফর ডাকু। পাঁচটা খুন আর ডাকাতির মামলা বুলছে মাথার ওপর। তার ভাবনা, বাঁকা এসে নিশ্চয় শেকলে তালা ঝোলাবে এবং রুষ্টির মধ্যেই মধুপুর ফাঁড়ির দিকে দৌড়ে যাবে। মুজফরকে ধরতে পারলে মোটা বকশিস।

বেন্দা হরিমতীর গোড়ানি শুনে আতংকে কাঁঠ হয়ে গেছে। গ্রামের বাইরে এই বাবুর বাগানে এমনিতেই কিছু ঘটলে মাথা ভেঙেও কিছু করার নেই। তারওপর এই রুষ্টি। রুষ্টিটা এখন একটু কমেছে। বাতাসও থেমে গেছে। মেঘ সরে চাঁদটাও বেরিয়ে এল। হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে বিরবিরে রুষ্টিতে গাছপালা ভুতুড়ে হয়ে উঠল। বেন্দা হরিমতীর মৃত্যুযন্ত্রণা শুনে কান পেতে আছে—কিন্তু হরিমতীর গোড়ানিটা গুনগুন কান্নায় মোড় নিয়েছে কেন বুঝতে পারছে না।

তারপর সে মুজফরের ডাক শুনে পেল, আই বেন্দা! আহিস? বেন্দা!

বেন্দা দাওয়ায় উঠে নাক ঝেড়ে বলল, বাঁ ?

শেকল খুলে দে।

খুলে দিলে তুমি চাকু মারবে !

মুজফর হেসে বলল, না বে শালা ভূত ! ছুঁচো মেরে মুজফর হাত
গন্ধ করে না । পয়সা দেব শেকল খুলে দে !

পুরনো আমলের দরজা ভীষণ শক্ত । লাগি মেরে ভাঙ্গা অসম্ভব ।
ঘরের দেয়ালও খুব উঁচু : চাল ফুঁড়ে বেরুতে হলে দেয়ালে উঠতে হয় ।
টর্চ আলো মুজফর দেখে নিচ্ছিল সব । চাকুটা তেমনি করে ঠেকিয়ে
রেখেছিল হরিমতীর পাঁজরে । হরিমতী গুণগুন করছে গলার ভেতর ।
ধমকে বলল, থাম্ মাগী ! জবাই করব ।

হরিমতী চুপ করল । বাইরে থেকে বেন্দা বলল, বোষ্টুমী ! দরজা
খুলব ?

হরিমতী অগ্নীল গাল দিয়ে বসল এবার । খোল না মা-মেগে
হতচ্চারা !

শেকল খুলেই বেন্দা ছিটকে উঠানে পড়ল । তারপর এক দৌড়ে
পালি ডিঙিয়ে ওপারে আগাছার ভঙ্গলে গিয়ে ঢুকল ।

মুজফর দরজা খুলে টর্চের আলোয় বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল,
ভেগেছে রাণ্ডীর বাচ্চা !

তারপর সে জুতো পরে দাওয়ায় গেল । চাঁদের আলোটা মেঘে
ঢেকে গেছে এখন । রুষ্টি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে । চারপাশে গাছপালা
থেকে জল পড়ার টপটপ শব্দ । আর অনেকদিন পরে রুষ্টির জল পেয়ে
পোকানা কড়গুলা আনন্দে গলা ছেড়েছে । গাঁ গাঁ করে ব্যাঙ ডাকছে ।
রাতের স্তব্ধতাটা আর নেই । চারদিকে ওইসব শব্দ ।

মুজফর ঘরে টর্চের আলো হরিমতীর মুখে ফেলে বলল, ঢঙ দেখালে
বোষ্টুমী । না হয় টাকাই দিতুম দশ-বিশটা ! মোছলমান বলে ঘেন্না
হল, তাই না ?

তারপর উঠানে সাবধানে হেঁটে আগড় ঠেলে বেরিয়ে গেল ।

হরিমতী চুপ করে রইল । এতক্ষণে সে ভাবছে, কুৎস্ন দেখছিল
নাকি ।

বেন্দা আগাছার ভেতর থেকে মুজফরের চলে যাওয়া দেখছিল ।

পাতলা মেঘের আড়ালে চাঁদ। কাকজোৎস্নায় এবং রাতবিরেতে বেন্দার দৃষ্টি ভাল লেগে—সে দেখল, মুজফর ডাকু পেটুল আর শার্ট পরে আছে। পেটুলের পা গোটানো হাঁটু অবধি। পায়ে জুতোও আছে। কাঁধে একটা কিট ব্যাগ ঝুলছে। তবে এই বেশে অনেক বার মাঠে ঘাটে বিলে বা নদীর ধারে মুজফরকে দেখেছে। লোকটাকে দেখে মনে হয় ‘বলক’ অফিসের ‘নেয়পেস্টের’ বাবু, ছাগল পালানীদের সমিতিতে যিনি আসেন। অর্থাৎ কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। তেমনি গৌফ, তেমনি বাবুর মতো চেহারা। ওর বাবা গফুর দর্জি মধুপুর বাজারে বুড়ো হয়ে মরে গৌরে গেছে। কে জানত, গফুরের ছেলে ডাকু হবে? যেমন তেমন ডাকু নয়, হিন্দি সিনেমার গব্বর খাঁ। বেন্দা গব্বর খাঁ কে দেখেছিল। তাই মুজফরকে এত ভয়।

বেন্দা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পাঁচিল পেরিয়ে ঢুকল। তারপর দাওয়ায় উঠে আস্তে ডাকল, বোষ্টমী!

হরিমতী বলল, থাম্ মুখ পোড়া বান্দর। আর একটু হলে এই খানে চাকু ঢুকিয়ে দিত।

বেন্দা থিকথিক করে হাসল। দাঁড়াও, লম্প জেলে দেখি। একগাদা আম কুড়িয়েছি—ছোটো নারকেল। কোথায় সব পড়ে আছে।

সে ঘরে ঢুকে চৌকাঠের পাশে দেশলাই খুঁজে নিয়ে লম্প জ্বালল। তখন হরিমতী বলল, দাখ্ তো, রক্ত বেরুচ্ছে নাকি? চিটচিট করছে কেন?

বেন্দা লম্পের আলোয় পাজরে হাত বুলিয়ে বলল, নাঃ। ভয় দেখাচ্ছিল।

হরিমতী হঠাৎ কঁদে ফেলল। আমার জাত মারতে চাইছিল রে বেন্দা!

বেন্দা লম্প রেখে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সাস্থনা দিয়ে বলল, আহা! মারে নি তো। চূপ করো দিকিনি! দরজা খুলে না

রাখলে তো এমন হত না। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। যাক্ গে
কেঁদোনা। বাঁকুদাকে সকালে কথাটা বলতে হবে।

হরিমতী হুহাতে ঝুকে জড়িয়ে ধরে তবু বাচ্চা মেয়ের মতো ছ ছ
করে কাঁদতে লাগল। বেন্দা অবাক। —

বালিকা বধু

মধুপুর খাঁড়ির সেপাই উপেন্দ্রের আবার ডিউটি পড়েছে বিল বাড়িতে।
সঙ্গে এবার ভগদীশ নয়, পাঁড়েজী—দাতারাম পাঁড়ে। পেলায় চোরা
এবং গোঁফ। কিন্তু লোকটি অমায়িক।

রোদের ডিউটি। রাত্রিযাপন করতে হবে বিলবাড়িতে। ছিচকে
চুরি চামারি চিরকাল হয়ে এসেছে গ্রামে। একসময় তা নিয়ে কেউ
কাঁড়িতে বা মহকুমা শহরের থানায় দৌড়ত না পঞ্চায়েতই ছিল তা
সব কেসের বিচার কর্তা। পুরনো ছিচকে দাগী (পুলিশের খাতার নয়,
পঞ্চায়েতের) নকুল বাগদী আর মদন বাউরি বুড়ো হয়েছে। নতুন
পিঁচকে বাগদী বলতে অনেক গুলো গজিয়েছে। পুকুরের মাছ চুরি,
হাঁস, মুরগী, চুরি, মাঠ বা খামার থেকে শীষধান চুরি—কিংবা শরত
কালে খালে ভোবায় পচতে দেওয়া পাট ও প্রতি রাতে কয়েক গোছা
করে তুলে নিয়ে যায় চোর এবং দূরের বিলে মনের সুখে কেচে আশ
বের করে। তবে সিঁদেল চোরের সংখ্যা কমেছে। বিল বাড়ির
আগের দিনে পঞ্চায়েত মন্দেহ ভাঙন চোর কে নানা রকম শাস্তি দিত।
জুতোর মালা, মাথা গাড়া, জুতোর প্রহার ইত্যাদি। বেশী বাড়
বাড়লে কাঁড়িতে নাম যেত। পুলিশও শুত পেতে ধরে নিয়ে গিয়ে
ঠেঙাত। কিন্তু ইদানিং হাওয়া উল্টোপাল্টা। বাগদী পাড়া, কুনাই
পাড়া, বাউরা পাড়ায় রাজনীতি চুকেছে। বাগা উড়েছে। নতুন
চোরদের গায়ে হাত পড়লে পঞ্চায়েতে বগড়া বেধে যাচ্ছে। পুলিশে
নাম গেলেও কিছু হচ্ছে না। তবে বেন্দার ব্যাপারটা আলাদা।

বেন্দা কমলাক্ষের ঝিয়ের বোন পো এবং তার বাড়িতেই মানুষ। তাকে পুলিশ খানোকা নিয়ে গিয়ে ঠেঙালে মাথাব্যথা না হওয়া উচিত কমলাক্ষের। হয় নি। বেন্দাকে নিয়ে তার জাত ভাইদের ওকোনো মাথাব্যথা নেই বরাবর। বেচা করার সঙ্গে কোনো দিন নেই। মিটিঙে নেই। মিছিলে নেই। ডাকলে যাচ্ছি বলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার অস্তিত্ব বিল বাড়িতে নেই বললেই চলে। সে এ গাঁয়ে সৃষ্টি ছাড়া জীব।

উপেন্দ্র আর পাঁড়েজী সূর্যাস্ত-কালে যখন গাঁয়ে আসছে, বিন্দে তখন 'ছেলে পোতা' নামে একটা খালের তলায় পাঁকজল হাতড়ে মাছ ধরছে। পাঁকে ভূত হয়েছে সে। উপেন্দ্র চিনতে পারত না। বেন্দা ভূত সাদা দাঁত বের করে হাসতেই চিনে ফেলল! উপেন্দ্র গোঁফ পাকিয়ে বলল, তুই সেই বিনোদ না?

বেন্দা বলল, হ্যাঁ সেপাই দা!

দাঁত বের করছিস যে?

বেন্দা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আজ্ঞে একটা খবর ছিল। বাঁকুদাকে দিয়ে ছিলুম। বলেনি ফাঁড়িতে?

উপেন্দ্র জানে না। সিগারেট ধরিয়ে বলল, কী খবর ছিল রে?

আজ্ঞে মুজফর ডাকুর। না মারেন তো কাছে গিয়ে বলব।

বেন্দা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টে উপেন্দ্রের ভাবগতিক বুঝতে চেষ্টা করছিল। পাঁড়েজী উদাস হয়ে উচু বাঁধ থেকে প্রকৃতি দেখছে। নরম বাতাসে তার কাঁচাপাকা গোঁফ ফুরফুর কাঁপছে। উপেন্দ্র বেন্দার ভয় দেখে আমোদ পাচ্ছিল। ইশারায় এবং ছু ছু করে কুকুর ডাকার মতো কাছে ডাকল।

বেন্দা বলল, ঝড়জলের রাতে মুজফর ডাকু হরিমতী বোষ্টুমীর ঘরে ঢুকেছিল সেপাইদা। চাকু মারতে যাচ্ছিল। আমি খুব চঁচিয়ে চোকিদারকে ডাকতেই মুজফর পালিয়ে গেল।

উপেন্দ্র মিটিমিটি হেসে বলল, তুই বাঞ্ছাত বোষ্টুমীর কোলে হুধু খাচ্ছিলি বুঝি?

লজ্জা পেয়ে বেন্দা মুখ ঘোরাল। বলল, আন্তে না, না। উ কী কথা ?

তার পেটে বেটনের মূহ গুতো দিয়ে উপেন্দ্র বলল, সত্যি বল।

বেন্দা একটু তফাতে সরে গিয়ে লাজুক হেসে বলল, আজ কাল বোষ্টুমীর কাছে থাকি। মাসি আমার সামনে থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিয়েছিল। কি করি বলুন সেপাইদা ? একটা জায়গা—থল তো চাই মানুষের।

উপেন্দ্র গলা চেপে বলল, বোষ্টুমীর পাশে শুস্ তো ?

যান ! আপনার খালি আবোল তাবোল কথা। —বলে বেন্দাবন আবার খালে নেমে গেল।

উপেন্দ্র হাসতে হাসতে চলে গেল। পাঁড়েজী তেমনি চোখে প্রকৃতি দেখতে দেখতে তার পেছন পেছন এগোল। বেন্দা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মুজ্জফরের কথাটা গ্রাহ্যই করল না। এ তো ভারি অবাক কাণ্ড।

রোদে ফাঁড়ির সেপাইরা আসবে বাঁকা চৌকিদার জানে। উঠোনে সতরঞ্চি বিছিয়ে আপ্যায়নের চূড়ান্ত করে। আইনরক্ষকদ্বয় বসলে তাড়ি ভাঁড় আনল বাক। তারপর বউয়েব উদ্দেশ্যে বলল, হা করে দেখছ কী ? গেলাস গুলান দাও শিগগিরি।

বাঁকার এটি তৃতীয় বউ। প্রথম বউ বাচ্চা হতে মারা পড়েছিল। দ্বিতীয় বউ এক বাস ড্রাইভারের সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল। তৃতীয়টি তিন কুড়ি নগদ টাকায় খরিদ বালিকা অবস্থায়। এই এক বছরেই ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে। বাঁকার মিতের নামও বাঁকা—সে হল বাউরি বাঁকা। হাইওয়েতে রোডস দফতরের গ্যাংন্যান। বাঁকা বাউরীর মতে, মিতে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে খাচ্ছে। আসলে মেয়েরা দ্রুত স্বামীর বয়সের সঙ্গ ধরে ফেলে। উপায় থাকে না বলেই।

বউয়ের নাম ভান্নভাই হবে ? বাঁকা অনুমান করে। কারণ তার মামা শশুর শাশুড়ী ভান্ন বলে ডাকে। পুরো নাম শুধোবার গরজ ছিল

না। নামে কী আসে যায়? ভানু অনেকটা ঘোমটা টেনে ছোটো কাচের গেলাস, একটা এনামেলের গেলাস আর পেঁতলের সরাতে মুন পেঁয়াজ তেল লংকার ঝাঝাল চাল কলাই ভাজা রেখে চলে গেল। তারপর লম্প জ্বলে দাওয়ার খুটির কাছে রাখল এবং চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ফাঁকে তাকিয়ে রইল।

পাঁড়েজীর চোখ সারাক্ষণ ঘোমটার দিকে এবং সুর্যোগ পেলেই চোরা চাউনিতে একঝিলিক হাসি ছুড়ে মারছে। উপেন্দ্র সেটা লক্ষ্য করে বিরক্ত। বাঁকা বকবক করছে আর ছিলিম টানার ভংগিতে সিগারেট টানছে। বৃষ্টির জল, মাঠের অবস্থা, বানবাজার বিপদ নিয়ে কথা বলতে বলতে অন্ধকার ঘন হল। আকাশ পরিষ্কার। হালকা হাওয়া এসে বাড়ি ঢুকছে মাঠের দিক থেকে। উঁচু ভিটের ওপর বাড়ির ওপর গাছগাছালি ঝুঁকে আছে। সে-রাতের বৃষ্টির গন্ধ মাটির গা থেকে মুছে যায়নি বলে পোকামাকড়, ব্যাঙ, সোনাগদি এবং তক্ষক ডাকতে শুরু করেছে।

ঘড়ি দেখে উপেন্দ্র বলল, বাবুদের একবার দেখা দিয়ে আসি। ওঠ পাঁড়েজী!

পাঁড়েজীর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু রোঁদে এসে গায়ের বাবুদের দেখা করার নিয়ম আছে। তাছাড়া বাঁকার বাড়ি রাত কাটানো নিয়ে বাবুরাই কথা তুলবেন ওপরগুলাদের কানে। আজকাল হাওয়া অগুরুকম।

তবে কমলাক্ষবাবু কিংবা সুখেনবাবুর বাড়ি গেলে রাতের খাওয়াটাও জুটে যাবে—বাড়তি খাওয়া। আসার আগে উপেন্দ্র গিলেছে একটা পাঁউরুটি আর গোটাকতক রসগোল্লা। পাঁড়েজী বুদ্ধি করে চাপাটি সঁকে খেয়ে নিয়েছে। ফাঁড়িতে বরাবর বড্ড ঝগড়াবাঁটি। মেস করা যায়নি। যে-যারটা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়। এ এস আইয়ের অবস্থা ক্যামিলি আছে। নতুন বউ এবং সুখের সংসার। উপেন্দ্রেরও নতুন বউ। কিন্তু পড়ে আছে বিরহিনীর মতো সেই ধুধুলিয়ায়। থানায় বদলি হতে পারলে কাছে এনে রাখবে।

পাঁড়েজী নাকি ব্যাচেলার। কেউ বিশ্বাস করে না। অনিচ্ছাসঙ্গেই উঠল আড়ামোড়া দিয়ে। এক হাঁড়ি তালরসে তিনটে সোমন্ত পুরুষের পা টলে না। তবু টলাতে ইচ্ছে করে। বাঁকা বলল, চলুন আপনারা। আমি যাচ্ছি।

যাবার আগে পাঁড়েজী ভান্নুর দিকে সেই চোরা ঝিলিক ছুড়ে গেল।

আইনরক্ষকরা চলে গেলে ভান্নু উঠোনের আসর থেকে এঁটো গেলাস আর হাঁড়িটা নিয়ে গিয়ে উঠোনের কোণায় ধোয়াপাখলার জায়গায় রাখল। তারপর চাপা স্বরে ছুর্বোধ্য কীসব বলতে বলতে দাওয়ার কোণায় রান্নাশালে গেল। মাটির ঢাকনের তলা থেকে কয়েকটা রুটি বের করল। বাঁকাটারা ছোট্ট এনামেলের হাঁড়িতে ল্যাটামাছের ঝোলে চুবিয়ে থেতে থাকল। বাঁকা উঠোনের শতরঞ্জিতে চিত হয়ে নক্ষত্র দেখছে। নেশা কমেনি। তবে রাতের বেলা আজকাল সে কিছু খায় না। অস্থল হয়ে যায়। বিকেলেই দুমুঠো মুড়ি কিংবা একটুকরো পাঁউরুটি খেয়ে নেয়। মাঝেমাঝে সখ করে চা বানিয়েও খায়। বিঘেদেড়েক চাকরান জমি আছে পূর্বপুরুষের। তার ওপর চৌকীদারী যৎকিঞ্চিৎ মাইনে। তার জীবন মোটামুটি চলে যাওয়ার মত—একটি বউসহ।

বাঁকা বলল, সিথান (বালিশ) দাও। এখানেই শুই। আর শোনো, কুলুপ আটতে ভুলে যেও না। তোমার ওই স্ত্রী।

ভান্নু আস্তে বলল, বাঘের ঘরে ঘোগ ঢুকবে না।

খিকখিক করে হাসল বাঁকা চৌকিদার। —তাই তো ঢোকে, বেন্দা ছোক ছোক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁদরকে বিশ্বাস নেই। সম্পর্কে ভাই হলে কী হবে? তারওপর ওই নাগীর সঙ্গে জুটেছে।

ভান্নু বলল, বোষ্ট্রুর্নীকাকী চাল ধার করতে এসেছিল।

দিয়েছ নাকি?

দিয়েছি। আমার কোমরের ব্যথাটা কমিয়ে দিলে। কত ওষুধ তো খেলুম।

রোজ এইসব কথাবার্তা হয়ে থাকে এসময়। পাশাপাশি শুয়েও চলতে থাকে। বয়স্ক লোকটা যখন বুড়ো বাঘের মতো ভানুর কাঁচা শরীরের মাংস কামড়ে-কামড়ে খেতে থাকে; তখনও ভানু চাপা স্বরে তার সংসারের কথা বলতে থাকে। বাঁকা বোঝে, তার সংসার খুব মনে ধরেছে নতুন বউটার। প্রথম এসেই যেরকম কোমরে আঁচল জড়িয়ে গেরস্থালি সামলাতে শুরু করেছিল, দেখে তাক লেগে যেত। বাঁকার উঠোন, দাওয়া, ঘরের মেঝে আজকাল তকতকে হয়ে থাকে। দেয়ালে গিরিমাটি গোলা বড় বড় রক্তের মধ্যে খড়িগোলা সাদারঙের পাখি, পদ্মফুল, কালীমায়ের চরণ আঁকা। ধান উঠতে শুরু করলে আবার নতুন করে সাজাবে বলে রেখেছে। বউটা কার্তিকের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু হেসে বলে, আমার বাবারও ছপাচকাঠা ছিল। পেটের জ্বালায় বেচে খেয়েছিল, তাই।

দরজায় কুলুপ এটে ছোটো বালিশ আর খেজুরতাল্লাই এনে বলল,
সতরঞ্জি-টঞ্জি হটাও।

ক্যানে, ক্যানে?

ওতে শোব না। ওঠ।

বাঁকা সরে গিয়ে বলল, মানুষকে ছি-ঘেন্না করতে নেই।

ভানু ঝাঁঝাল করে বলল, মানুষ নাকি?

চুপ, চুপ।

বিছানা করে লম্প খুঁদিয়ে নিবিয়ে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে ভানু পেটের কাপড় ঢিল করতে করতে বলল, ওই নতুন সেপাইটা ভাল না। আর কখনো ওকে বাড়ির ভেতর ডেকে না।

বাঁকা হাসতে লাগল।

সেদিনকার মতো মুঁগির ঝোল খাওয়াবে নাকি?

আহা সে তো নিজের পয়সায় খেয়েছিল।

নিজের পয়সায়? আমি শুনি নি কিছু? —একটু চুপ করে থাকার পর আবার বলল ভানুমতী, কাল আমি সৈরভীদিদের সঙ্গে

দোহালিয়া বিলে যাব। বারণ করতে পারবে না। খুব শুশনি শাক হয়েছে। অনেকদিন শুশনি পাতা খাইনি।

বাঁকার মন তার শরীরের দিকে। বুকে নাক গুজে বলল, সাবুন মেখেছ নাকি? সুন্দর গন্ধটা তো।

মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভানুমতী বলল, তোমার খুঁবে ভবভব করে তাড়ির গন্ধ বেরুচ্ছে। সরে শোও

বাঁকা নিস্তেজ হয়ে গেল হঠাৎ। চিত হয়ে শুয়ে নক্ষত্র দেখতে দেখতে বলল, আচ্ছা! তোমার পেটেকোলে কিছু আসছে না ক্যানে বলোদিকিনি?

হাঁ। আমি বাঁজা যে! ভানু রাগ করে বলল। তারপর গলার ভেতর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, মুরোদ আছে মরদের?

আচমকা তালপাতার বেড়ার দিক থেকে টর্চের আলো এসে দুজনের ওপর পড়েই নিভে গেল। ভানু ছিটকে সরে উঠে বসেছিল। গায়ে কাপড় ছড়াতে থাকল। বাঁকা ধুড়মুড় করে উঠে বলল, কোন শালারে?

উপেন্দ্রের গলা শোনা গেল। —ধুর বাঞ্ছোত! তোনরা উঠোনে পড়ে আছ কে জানে!

অ। বাঁকা বিরক্ত হয়ে বলল। তা আগে একটুকুন সাড়াশব্দ দেবেন তো!

আগড়াহীন বাড়ির ভেতর আইনরক্ষকদ্বয় বুটের শব্দ করে ঢুকে পড়ল। পাঁড়েজী হাসতে হাসতে বলল, এখানে শুত করছ কেনো? বিষ্টি হবে তো ভিজে যাবে।

ভানুমতী তখন দাওয়ায় চলে গেছে। উপেন্দ্র বলল, অগ্নায় হয়ে গেছে বাঁকা। কিছু মনে করো না।

বাঁকা বলল, বাবুদের সঙ্গে দেখা হল?

কমলবাবুর হল। উপেন্দ্র বলল। সুখেনবাবু কলকাতা গেছে।

উদ্বিগ্ন বাঁকা বলল, শোবার জায়গা?

কমলবাবুর বারান্দায় শোব। আবার কোথা? সে তোমাকে

ভাবতে হবে না। —বলে উপেন্দ্র ওদের খেজুর তালাইয়ে বসে পড়ল।
পাঁড়েজীও বসল।

বাঁকার চৌকিদারীজীবনে এসব ঝামেলা কিছু নয়। চৌকিদার
সবার চাকর। গাঁয়ের পঞ্চায়েত বাবু হোক, কিংবা সরকারী লোক—
সবাই তাকে হুকুম করে। পালন না করে পার নেই। সমবায় সমিতির
ঋণ আদায়ের দিনও তাকে নাল উদ্দি পরে হাজির থাকতে হয়। গাঁয়ে
সরকারী লোক যেই আসে, সেই প্রথমে বলে, চৌকিদার কোথা ?
আর আইনরক্ষকরা এলে তো কথাই নেই। না-থাওয়া না-নাওয়া
বাঁকাকে পেছন-পেছন ঘুরতে হবে। কখনও সারারাত জেগে কাটাতে
হবে।

এই একবছরে ভানুমতীর ঠাণ্ড হচ্ছে, চৌকিদারের বউ বলে তার
সব গর্বের দালানবাড়িটা যেন বালির ওপর বানানো। তার আধবুড়ো বর
চৌকিদারকে সে ভাবত রাজার লোক—রাজপ্রতিনিধি। তার মামা-
মামী বলেছিল, আনাদের ভানুর বর ‘সরকারী লোক’। ভানু ঘর
করতে এসে সেই দাপটে ঘুরেছে পাড়ায়। এখনও ঘোরে না, তা নয়।
বগড়া হলে শাসিয়ে বলে, থামো। দেখাচ্ছি মজা। চৌকিদার
আমুক।

বিলে মাছ ধরতে গিয়ে ইজারাদার তাড়া করেছিল। তখনও তাকে
শাসিয়েছিল ভানু—আমি কে জানো ? কার গায়ে হাত দিতে আসছ
জানো ? আমি চৌকিদারের বউ।

ইজারাদার বেজায় হেসে বলেছিল, আরে যা যা !

এখন সারাবছর এসব কাণ্ড দেখে ভানুর মোহ ভেঙে যাচ্ছে।
দাওয়ায় অন্ধকারে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রুই সাপিনীর মতো
ফণা তুলে রয়েছে। স্নুযোগ পেলেই যেন ছোবল দেবে। ভারি তো
পুলিশ ! পুলিশ বলে মাথা কিনে নিয়েছে। রাতবিরেতে একটু শাস্তিতে
শুতেও দেবে না !—

উপেন্দ্র বলল, পাঁড়েজীর গলা ভেজেনি। তখন থেকে উসখুস
করছে। একবার বাউরিপাড়ায় দেখ না, বোতলটাক গোলাই পাও

নাকি। ফাঁড়ির লোক গুনলে কবুল করবে না। তুমি অশ্রু কিছু বলো
যাও দিকি দাদা আমার।

বলে সে টর্চ জ্বলে একটা পাঁচটাকার নোট ধরিয়ে দিল বাঁকাকে।
অনিচ্ছায় বাঁকা উঠল। পদো বাউরি চোলাই করে। আবগারির
হামলাতো হয় মাঝেমাঝে। কিন্তু কে খবর দিয়ে আসে, চৌকিদার
হয়েও বাঁকা জানে না।

বাঁকা বলল, আমার টর্চবাতিতে বেটারি ফুরিয়েছে। স্মুথেনবাবুকে
বলেছি। কবে দেবে কে জানে। বরঞ্চ আপনার টর্চবাতিটা দিন।
আজকাল পোকামাকড় বেরুনোর সময় রাস্তাঘাটে।

উপেন্দ্র টর্চ দিলে সে বউকে বলল, তুমি আর জেগো না। ঘরের
ভেতর শুয়ে পড়ো।

ভানু বলল, শোব তোমার মাথায়? তালাইটা দিয়ে যাও।

উপেন্দ্র ও পাঁড়েজী সশবাস্ত্রে উঠে দাঁড়াল, যেন খব অশ্রায় হয়ে
গেছে। বাঁকা শতরঞ্জিটা এনে পেতে দিল আগের মতো। তালাই ও
বালিশদুটো বউকে দিল। তারপর বেরিয়ে গেল।

ভানু বাটপট অন্ধকারেই তালা খুলে ঘরে ঢুকল এবং মেঝেয় বিছানা
করতে থাকল। ঘরের ভেতর গরম বডড। মনে মনে আইনরক্ষকদের
শাপ-শাপান্ত করতে-করতে সে দরজা আটকাচ্ছে, সেই সময় উপেন্দ্র
উঠে এল। ফিসফিস করে বলল, এই! শোনো! এই টাকা দশটা
রাখো তো।

পাঁড়েজী সমস্ত ইন্ড্রিয়ের দরজা খুলে কান পেতে আছে।

ভানু চমকে উঠেছিল। বলল, কিসের টাকা!

তোমাকে আমরা দিচ্ছি। আগ, নাও না! চৌকিদারের আসতে
দেরি হবে।

ভানু হিসতিস করে বলল, না।

আগ, লজ্জার কী আছে? নাও

না। সরুন দরজা দিই।

ডঙ করো না। পরে আর দশটা নিও

ভানু বলল, কুকথা বললে চোঁচিয়ে লোক ডাকবো। সরুন।

উপেন্দ্র বলল, জানো? তোমাকে এক্ষুনি এ্যারেস্ট করে কাঁড়িতে নিয়ে যেতে পারি? তোমার কোনো বাপও বাঁচাতে পারবে না। যা বলছি, লক্ষ্মী মেয়ের মতো শোনো।

উঠোন থেকে পাঁড়েজী বলল, আরে লো না। এক রাত্র বন্ধু হোবে তো কী হোবে? দো মিনিটের কারবার।

উপেন্দ্রের মুখের ওপর কপাটছুটো জোড়া হয়ে গেল। খিল পড়ল। মুখ বাঁচাতে সরে এসেছিল উপেন্দ্র। দুমিনিট গুম হয়ে ঘামতে ঘামতে সে অস্থির। তারপর বলল, শোনো। চৌকিদারের কানে তুললে কিন্তু বিপদে পড়বে। তোমাদের দুজনেই ধরে নিয়ে উন্টো করে ঝোলাব।

তারপর সে উঠোনে নেমে গলা চড়িয়ে বলল, এ শালা চৌকিদার কবে বিপদে পড়বে, বুঝলে পাঁড়েজী? মুজফর ডাকুর সঙ্গে শালার জেনদেন আছে।

পাঁড়েজী সায় দিয়ে বলল, হুঁ হুঁ।

তই আইনরক্ষক সিগারেট টানতে থাকল গুম হয়ে। ওপরে দৃষ্টি নক্সতপুঞ্জের দিকে। মেয়েটাকে বুঝতে তাহলে বেজায় ভুল হয়ে গেছে। এমন তো হবার কথা না। নাকি পাঁড়েজীকে দেখে ঘাবড়ে গেছে বাজিকাবধ?

কিছুক্ষণ পরে চৌকিদার ফিরে এসে বলল, হল না। বললে, এক ফোঁটা মাল নেই। করবে কী দিয়ে? খরার মাসে আকাড়া চলছে। চাল গুড়-টুড় পাবে কোথা? কথা মিথ্যা নয় সেপাইজী। বাউরিপাড়ায় খবর ভাতের কষ্ট।

বাঁকা ফেরত নিয়ে উপেন্দ্র বলল, তুমিই শালা মহা তাঁাদোড় হয়েছ। একটুকু মাল যোগাড় করতে পারলে না! তুমি কোন খাটের জল খাচ্ছ, তাও জানি। সময় হলে টের পাবে। এস পাঁড়েজী।

দুজনে জুতোর প্রচণ্ড শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। বাঁকা হতভম্ব। একটু পরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, কই গো! খোলো!

ভেতর থেকে ভানুমতী বলল, স্নানাতদের সঙ্গে যাও না। আজ আর শুতে হবে না।

আহা! কী করব? ওনারা আমার ওপরওলা।

চৌকিদারী ছেড়ে দাও। ...ভানুমতী দরজা খুলে বলল। নৈলে আমি বাড়ি ছেড়ে যদিকে ছুচোখ যায়, পালিয়ে যাব।

ঘরের গরমে সেক হয়েছ। তাই রাগ হওয়া স্বাভাবিক। বাঁকা ভাবল। বলল, বরঞ্চ দাওয়াতেই বিছানা করো। আবার না এলে বাঁচি।

বাবুর বাগানে বৃষ্টি

হরিমতী কুলোয় গমের কুটো বাছতে বাছতে বেন্দার দিকে সন্দ্বিদ্ধদৃষ্টে চেয়ে বলল, তোর সব ভাল বেন্দা—খালি চোটামিটুকুন যদি ছাড়তিস।

বেন্দা বাগানজুড়ে শশার বীজ, লাউয়ের বীজ, বেগুনচারা পুঁতেছে। বৃষ্টির জলে বাবুর বাগানের মাটি হয়েছে নরম। বলেছে, দেখো মা বোষ্টুমী, তোমার বাড়ির ভোল বদলে দেব। কোথেকে কার কাছে বীজ নিয়ে আসে, ভেবে পায় না হরিমতী। ছটোমাস বেন্দা গায়ে ঘাম ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। কাল গেছে জষ্টিসংক্রান্তি। মধুপুরে মনসার নামে মেলা বসেছিল। অনেক রাতে বেন্দা ভিজতে-ভিজতে একটা চকচকে নতুন হেরিকেন নিয়ে ফিরেছিল। সেই সঙ্গে কৌচড় ভর্তি জিলিপি।

জবাগাছের একটা চারা পুঁতেছে এখন। বলল, তুমি খালি চোটামিই দেখ। সেই রেতের বেলা থেকে চোটামি-চোটামি করছ। অমন করলে মাইরি আমার পোষাবে না।

সে সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে হরিমতী মিষ্টি হাসল। ...আহা, রাগ করিস কেন? কাছে আয়, পিঠে স্ফুস্ফুড়ি দিয়ে দিই।

বেন্দা রাগ করে বলল, তুমি যে একটা হাঁস মেরে এনেছিলে। সেটা চুরি না? আমি চোর, আর তুমি সাধু!

হরিমতী হাসতে হাসতে বলল, সে তো জেবনে ওই একবার। তুই বিশ্বাস কর বেন্দা! কেউ বলতে পারবে না, হরিমতী কারুর জিনিসে ভুলেও হাত দিয়েছে। হ্যাঁ—হাঁস মেরে এনেছিলুম বটে। সেটা ঝাঁকের মাথায়। তুই মাংসের ঝোল খেতে চাইলি, তাই। কিন্তু এখনও মনটা বড় ধুকুপুকু করে রে।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে ফের বলল, তাই বলে আর নয়। তুই মাথা ভাঙলেও নয়।

বেন্দা খুরপিটা জোরে মাটিতে ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ওরে আমার! যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর?

হরিমতী মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

বেন্দা সামনে এসে বলল, এই দুটো মাস মুনিশ খেটে গতর কালি করে তোমাকে খাওয়াচ্ছি বোষ্টুমী। আর তুমি খালি চোর-চোর করছ দুখেলা। কৈ, দাও আমার হেরিকেন।

হেরিকেন নিয়ে কোথা যাবি?

যেথা যাই, তোমার কী? আর তোমার বাড়ী আসব না। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

হরিমতী গমের কুলো রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর মিষ্টি হেসে দাওয়া থেকে নেমে ওর হাত ধরে টেনে দাওয়ায় বসিয়ে দিল। আহা! রাগ করিস কেন? তোর ভালর জন্তেই তো বলছি।

না। আমার ভাল কাউকে দেখতে হবে না। আমার পোষাবে না। চলে যাব।

গেলে তোকে আটকে রাখতে পারব না বেন্দা।... হরিমতী হুঃখিত স্বরে বলল।...তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী? আমার কাছে ভাল না লাগলে চলে যাবি। তবে কথাটা শোন সোনারমানিক আমার। আমাকে রাতকানা রোগে ধরেছে। দিনেও আজকাল ক্রিমে ক্রিমে সব ঝাপসা দেখছি। শরীরের যা হাল গতিক, রোগ ব্যাধিতে ধরলেই

আর বাঁচব না। তাই বলছি, ভালমতে থাক। ই বাবুর বাগান আমি তোকেই রেজিস্টারি করে দিয়ে যাব। পাঁচ কাঠা জায়গার দাম কম নয় বেন্দা। আর.....

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আর তোকে বলেছিলুম— আমার কিছু গয়নাগাঁটি আছে। সেও তোকে দিয়ে যাব। রাঙা টুকটুকে মেয়ে দেখে বে করবি। তাকে পরিয়ে দিবি।

এবার বেন্দা হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। বলল, এমন করে বলছ যে এক্ষুনি মরতে বসেছ। তোমার মরার আগে আমিই না মরি বোষ্টুমী। আয়নাখানা নিয়ে এসে নিজেকে একবারটি দেখ না কী হয়েছে ?

হরিমতী ভুরু কঁচকে বলল, কী হয়েছে রে মুখপোড়া বাঁদর ?

বেন্দা বলল, বয়স কমে যেয়েছে তোমার। ইদিকে খেটে-খেটে আমিই বুড়িয়ে যাচ্ছি

কথাটা সত্যি। নিয়মিত ছমুঠো খাত জোটার দরুন হরিমতীর গায়ে মাংস লেগেছে। গাল ফুলে চেকন হয়েছে। পাঁজরের হাড় ঢেকেছে এবং স্তন দুটিও পূর্ণ যুবতীর মতো আবার ডাগর হয়েছে। সে কপাল চুলে একটি করে গন্ধ তেল ঘষে। গন্ধতেলটা বেন্দা মধুপুর থেকে এনেছিল, চুরিও হতে পারে। চুল আঁচড়ে হরিমতী তার বাগানে দাঁড়ালে লোকের এম হয়, এ বুঝি সেই গোবিন্দের দিনকাল ফিরে এসেছে বাবুর বাগানে। লোকে বলে, বেন্দার যৌবন চুষে ভিবড়ে করে ডাইনি মাগীটা নিজের ভাল ফিরিয়েছে।

বলে বটে ডাইনি মাগী, কাচ্চাকাচ্চার অসুখ বিস্ময় হলে তার কাছেই এসে দাঁড়ায় তাদের বউরা। হরিমতীর মা নির্মলা ছিল বড়ি বুড়ি বিল বাড়িতে। অনেক রকম ঠিকন-ঠাকন ঔষুধপত্র জানত। মাছলী জলপড়াটা দিত। হরিমতী মায়ের কাছে বিত্তার অল্পসল্প পেয়েছে বলে লোকের বিশ্বাস।

হরিমতী সুখেনের দাদা তিতেনের রোগা বউটাকে কী ভাবে সারিয়ে তুলল! লোকে অবাক হয়ে যায়। তবে মাঝধান থেকে

হরিমতীর বড় লাভ, তার বাগানবাড়ি রক্ষা পেয়েছে কমলাক্ষের হাত থেকে। স্বথেন বলছে, দাদা! গরীব মেয়েটার সামান্য পাঁচকাটা জায়গায় আর হাত নাই বা দিলেন? তাছাড়া জায়গাটা তো আইনত হরিমতীর নামেই রেকর্ড হয়েছে। আমি স্বচক্ষে সেই রেকর্ডপত্র দেখেছি।...

মেঘে রোদ ঢেকে গেল এসময়। তারপর বিরবির করে বৃষ্টি এল। পা তুলে সরে দাওয়ায় দেয়ালের দিকে সরে গেল বেন্দা। হরিমতী বলল, বর্ষা এবারে ভরত্ব হবে। ও বেন্দা, জাল বুনবি বলছিলি যে। নদীতে এবার খুব মাছ হবে, বুঝলি?

বেন্দা আনমনে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, গুনে দেখলে তুমি! কী আমার গুনি মনে রে!

হরিমতী বলল, আগাম বর্ষা যেবার হয়, সেবার খুব মাছ হয়।

বেন্দা বলল, ওবেলা মধুপুর যাব। দেখি, খানিক লাচি সূতো পাই নাকি। একটা টাকু চাই। মনাকাকাকে ধরব। যো বুনে দেবে।

হরিমতী গমের কুলোটা তুলে দাওয়ার কোণায় উলুনের কাছে নিয়ে গেল। গমগুলো ভেজে ফেলবে শুকনো খোলায়। তারপর সেদ্ধ করবে। দারুণ স্বাদ হবে।

উলুনের পাশে শুকনো কাঠের পাঁজা রয়েছে। খরার দিনে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনে রেখেছে। উলুন জ্বলে বলল, শলাই কাঠিটা গ্যাকডায় বেঁধে রেখেছিলুম। টাটকা হয়ে আছে দেখছিস?

এটা এমন কিছু বলার কথা নয়। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছে করছে বেন্দার সঙ্গে। বৃষ্টিটা ঝমঝমিয়ে উঠেছে। চার দিক ধূসর হয়ে গেল বেন্দা বলল, হুঁ।

কী ভাবছিস বল তো অমন করে?

হেরিকেনটা বেচে দেবে।

না। থাক্ আমাদের দরকার নেই বুঝি? একটা লম্প মোটে কেরাচিনের নদী বইছে তোমার ঘরে।

হরিমতী হাসল।...তুই আনবি কেরাচিন মধুপুর বাজার থেকে।

আমি তো চুরি করে আনব।

হরিমতী খোলায় গম দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, আবার ওই কথা ?
তোমার রাগ পড়ছে না দেখছি। নে, ছুমুঠো গমভাজা খা গরম গরম।

বেন্দা খুশি হয়ে বলল, আচ্ছা বোষ্টুমী ! একটা কথা বলি শোনো।

হরিমতী কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তুই বোষ্টুমী-বোষ্টুমী করিস নে
তো। তোকে বলেছি না—কখনো বোষ্টুমী বলবিনে। আমি কি
ভেক নিয়েছি, না কোঁটাতেলক কেটেছি !

বেশ, বেশ। কিন্তু কী বলে ডাকব ? বেন্দা খ্যা খ্যা করে হাসল।

কিছু বলে ডাকতে হবে না।

আগে মাসি-টাসি করতুম...বেন্দা ভুষ্টুমি করে বলল।

অসম্ভব কাঠ বের করে হরিমতী বলল, মারব বেন্দা ! তোমার কোন
জন্মের কোন বাবার মাসি ছিলুম রে ?

বেন্দা হাত বাড়িয়ে বলল, কৈ গমভাজা দাও। খেতে খেতে
কথাটা বলি।

ছুমুঠো ভাজা ভাজা গম একটা মাটির ঢাকনে করে দিল হরিমতী।
খেতে খেতে বেন্দা বলল, স্নুথেন মাস্টারকে জিগ্যেস করো না—
আবার ওনারা কবে মাটিকাটার কাজ করাবে। বেশ মাইরি অতগুলো
করে গম পাচ্ছিলুম। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চলবে কী করে,
তাই ভাবছি।

হরিমতী বলল, জিগ্যেস করব।

আর একটা কথা।

হরিমতী তাকালো।

গয়নার্গাটিগুলো পরো না কেন বলো তো ? কোথায় রেখেছ ?

হরিমতী হাসল। পাবি, পাবি। তোকেই দিয়ে যাব সব। স্নুহালে
থাক না কাছে। সব পাবি।

আছি তো !...বলে বেন্দা ফাঁচ করে হাসল। কিন্তু তোমার সঙ্গে
এই যে আছি, লোকে মাইরি বড্ড ঠাট্টা করে। তাই মনে-মনে অনেক-
সময় ভাবি....সে থেমে গেল হঠাৎ।

কী ভাবিস ?

ভয়ে বলি কী নির্ভয়ে বলি ?

চুপ করিস নে। যা বলতে চাস, বল।

তোমার সিঁথেয় একটুকুন সিঁছর এনে দেব।...বেন্দা ভ্রম করে বলে
ভেমনি হাসতে লাগল।

হরিমতী মুখ ঘুরিয়ে গম ভাজতে থাকল। অনেকক্ষণ চুপ করে
রইল।

বেন্দা ডাকল, বোষ্টুমী !

আবার বোষ্টুমী ?

ধুস্ শালা ! কী বলব তবে ? বেন্দা গৌ ধরে বলল।

আমি বোষ্টুমীই বলব—তুমি রাগো আর যাই করো ! সে বাকি
গমভাজাগুলো মুখে পুরে চিবুতে থাকল।

হরিমতী আশ্তে বলল, তোর মুখে বোষ্টুমী শুনলে বড্ড পর লাগে
বেন্দা। আর তো তুই আমার পর না। তোকে কী দিতে বাকি
রেখেছি আর ?

ওই দেখ ! তোমার মাইরি বড্ড ছিচ্ কাঁছনে স্বভাব।

বেন্দা, তুই আমাকে এ বয়সে খুব সুখ দিয়েছিস ! এত সুখ
জীবনকালে পাইনি রে !...হরিমতী সুখের কান্না কাঁদতে কাঁদতে নাক
মুছল আঁচলে।

বেন্দা হাই তুলে বলল, পুকুরে ডুব দিয়ে আসি গে। গাময় কাদা
লেগে আছে।

তারপর ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। হরিমতী
সুখের কান্না থামিয়ে এনামেলের হাঁড়িতে ভাজাগম সেদ্ধ করতে দিল।
ঘরে ঢুকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করল। আয়না নিয়ে দাওয়ায় এসে
সরু সরু দাঁতগুলো দেখল। মুখ দেখল। দৃষ্টি সত্যি কি ঝাপসা
হয়ে আসছে দিনেদিনে ? ভগবান, মুখ তুলে তাকিও অভাগিনীর
দিকে। অন্ধ হয়ে গেলে খুব কষ্টে পড়বে হরিমতী। বেন্দাকেও হয়তো

কোনো লোভেও আটকানো যাবে না। বেন্দা চলে গেলে আর বাঁচবে না হরিমতী।

হয়তো বৃষ্টিবাদলার দিনে আলো কম এবং আয়নাটাও পুরনো, তাই এমন একটু-একটু ঝাপসা লাগছে। তবে অনেকদিন পরে নিজেকে সুন্দর দেখতে পেল হরিমতী। এখনও চুল পাকেনি—দু'একগোছা কোথাও লুকিয়ে থাকে বটে। ওটা নিশ্চয় 'বায়ুদোষ'। আরও কমবয়সে কি চুল পাকে না লোকের ?

তারপর পুরনো সিঁদুর কৌটোটা তাক থেকে হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল হরিমতী। লজ্জা করে—বড় লজ্জা করে। নিজের হাতে যদি পরিয়ে দেয় বেন্দা, পরবে। তখন লজ্জা করবে না।

শেষে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে আমগাছটার তলায় দৃষ্টি রেখে গয়নার বাকসোটার কথা ভাবতে থাকল হরিমতী। আবার লোভ গরগর করে উঠল বুকের মধ্যে। গয়না পরবে, না, পরবে না—তাছাড়া বেন্দারই বা কোনো মতলব আছে কি না—তাও বুঝতে পারছে না, বড় সমস্যায় পড়ে গেল হরিমতী।

বেন্দা বাগিদপাড়ার পুকুরে বৃষ্টির মধ্যে অনেক্ষণ ডুব সাঁতার খেলে ফিরল যখন, তখন গমসেক্ষ শেষ করে হরিমতী ছোটো টিনের থালায় জুড়োতে দিয়েছে। রাতের রান্না করা মাগুরমাছ গরম করে ছোটো পাত্রে ঢেলেছে।

বেন্দার ভেজা লুঙি দাওয়ায় চালের বাতায় গুঁজে মেলে দিল হরিমতী। ছেঁড়াফাটা ধুতিটা ফটফটে সাদা করে কেচে রেখেছিল। বেন্দা ফেরতা দিয়ে পরে হরিমতীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর ফিক করে হাসল।

হরিমতী বলল, হাসলি যে ?

কপালে টিপ পরেছ। বড় সুন্দরী লাগছে হরিমতীকে। তাই হাসছি।

হরিমতী রাঙা হয়ে বলল, ওই ! উ কী রে ? নাম ধরে ডাকলি—বড় বাড় বেড়েছে, না ?

দাড়াও, একটুখানি দাঁড়াও। তোমাৰে দেখি মাইরি !

ঢ্যামনামো রেখে পাতে বস্। জুড়িয়ে গেল।

জুড়োক। তুমি জুড়িও না—তাহলেই হল। ...বেন্দা দুহাতে হরিমতীকে শূন্যে তোলার চেষ্টা করল। পুরোটা ওঠাতে পারল না পাছটো ছুঁয়ে রইল মেখে।

হরিমতী পড়ে যাবে বলে কিংবা নায়িকার চাপল্যে তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। বলল, ওই ওই ! ই কী দিনছাপুরে ! ও বেন্দা ! ছাড়, ছাড়। কেউ দেখলে কী বলবে ?

দেখতে কেউ বাকি আছে। বলে বেন্দা শেষ অব্দি তাকে নামিয়ে দিল। হাঁফিয়ে উঠেছিল অল্পবয়স্ক নায়ক। নায়িকার বয়সের প্রায় অন্ধেক তার বয়স। হাঁফাতে হাঁফাতে ফের বলল, তোমার মাইরি 'ওজন' বেড়েছে।

হরিমতীর মনে প্রেমের ছোঁয়া গাঢ়। আবিষ্টভাবে অক্ষুট করে বলল, বেন্দা ! আমার সিঁথেয় একটুকুন সিঁদুর দিবি ? শেষকালটা সধবা হয়ে কাটাই ! দিবি বেন্দা ?

বেন্দা বলল, কৈ সিঁদুর ?

হরিমতী ঘরে ঢুকে তাক থেকে সিঁদুর কৌটোটা পাড়ল আবার। কতকাল আগে কেনা সিঁদুর। মাঝেমাঝে চৌকাঠের মাথায় আর দেওয়ালের সস্তিকাতাতে ঘষে উজ্জল করে দেয়। তলায় ঠেকেছে। কৌটো খুললে বেন্দা আঙুলে চিমটে করে তুলে বলল, কৈ এস।

হরিমতী মাথায় তার প্রায় সমান। সিঁথি পেতে আস্তে বলল, দাও।

সিঁদুর দিলে সে সধবাদের মতো মাথায় ঘোমটা টেনে বেন্দার পাছটোতে মাথা ঠেকিয়ে চিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল। বেন্দা আমুদে ভংগিতে হাত তুলে বলল, আশীর্বাদ করি—আশীর্বাদ করি।

হরিমতী দ্রুত উঠে বলল, হিঃ ! ঠাট্টা করতে নেই। আমি তোমার হলুম আজ থেকে।

বেন্দা হুহাতে জাপটে ধরে বলল, ওরে আমার বউরে ! আমার হরিমতী বউরে ! আমার বোষ্টুমী বউরে !

হরিমতী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি কি এখনও ভাবছ ঠাট্টা ?

বেন্দা চোখে হেসে মাথা দোলাল। না না। মাইরি বলছি, তোমাকে বড্ড সুন্দরী লাগছে।

আবেগে ছলতে ছলতে হরিমতী বলল, খেতে বসো। জুড়িয়ে গেল। আজ রেতের বেলা বরকত চালগুলো রেঁধে আমরা ভাত খাব। হাঁড়িতে জিয়ানো মাগুর মাছ আছে। ঝোল করব।

বেন্দা বলল, তুমি চান করবে না ?

আমি তো রোজ ভোরবেলা চান করি। জানো না ?

ছুজনে যতক্ষণ খেল, আর কথা বলল না। খাওয়ার পর হরিমতী ঢেকুর তুলে বলল, তোমার বোধ করি কম হল ভাগে ?

বেন্দা বাঁকা মুখে বলল, ধুস ! জোর করে অতটা খেলুম। তোমার ডবল। আমার গনসেক্স মুখে রোচে না।

হরিমতী বলল, আমারও কি রোচে ? চালের যা দর।

কাল রাতে এক প্যাকেট সিগারেটও এনেছিল বেন্দা মনসার থানের মেলা থেকে। দাওয়ার উল্লুনের আগুনে ধরিয়ে এনে বলল, খাবে নাকি একটা ?

হরিমতী তালাই বিছিয়ে বলল, ছুটান দিও। ওতেই হবে। আমার আর তত ভাল্লাগে না ?

বেন্দা বাইরে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, কাড়ান হয়ে গেল। দিনটা বড় ভাল। এই শোনো ! এলে পুকুরে জল ঢুকছে ‘জোলের’। জালি থাকলে মাছ ধরতুম অনেক। তোমার ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি থাকলে দিও।

তালাইয়ে পা ছড়িয়ে বসে হরিমতী বলল, আর ভিজতে হবে না। জ্বরজ্বালা হবে। চুপচাপ শুয়ে থাকো দিকিনি। পিঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছি।

বেন্দা সিগারেটটা ওর হাতে গুজে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বলল, দরজাটা আটকে দাও না। চোখে আলো লাগছে।

হরিমতী শুড়শুড়ি দিতে দিতে বলল, তোমার বাপু মতলব ভাল না। দিনছপুরে ওসব কী?

বেন্দা থি থি করে হাসতে হাসতে বলল, আমার মাইরি মোনটা ছটফট করছে জানো? পুকুরে যা দেখে এলুম। উরে বসাস!

হরিমতী একটু উঠে দরজার বাইরে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কপাট ছোটো ঠেলে দিল। ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট খুলখুলি মতো আছে উচুতে বাঁশের বাতার গারদদেওয়া। রোদ্দুর থাকলে একটু আলো আসে। এখন বৃষ্টিতে পৃথিবী ধূসর হয়ে আছে।

হরিমতী বলল, কী দেখলে?

বাকুদার বউ চান করছিল। বেন্দা ফিসফিস করে বলল, ভেবেছে বিষ্টিবাদলায় পুকুরে কে আর আসবে। আমি গিয়ে পড়তেই গলা ডুবিয়ে বসে পড়েছে।

হরিমতী ওর মুখে হাত চেপে ফুঁসে বলল, পরের বউয়ের গতর দেখে এসে আবার গপ্প করা হচ্ছে? আমার মতো মেয়েটাকে পেয়েও থাকতি মিটল না? কী আমার পালোয়ান মরদ রে!

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বেন্দা বলল, বাকুদাটা বুড়ো হাবড়া। পড়ত আমার মতো লোকের হাতে! তারপর সে বাঁকার বউ ভানুমতীর শরীরের একটা অশ্লীল বিবরণ দিতে থাকল।

হরিমতী তাকে খামচাতে শুরু করল। বেরোও আমার বাড়ি থেকে। যাও, বাঁকার মাগের কাছেই যাও নেনকহারাম!

বেন্দা বলল, আহা হা হা! এমন করো কেন? কথার কথাই বলছি।

আনি থাকতে তোমার অন্ন মেয়ের দিকে চোখ যাবে ক্যানে?

এ্যাই! আবার কান্না কাটি! মাইরি, তোমার সবই ভাল— শুধু এটুকুই বড্ড খারাপ।

হরিমতী আস্তে বলল, আমাকে ভাল না লাগলে চলে যাও।

যাব?

হ্যাঁ যাও।

বেন্দা উঠল। তারপর দরজা একটু ফাঁক করে দেখে তখনই বন্ধ করে
বলল, উরে শালা কী বর্ষণ বর্ষাচ্ছে! নদীতে বান এসে যাবে রাতারাতি।
হরিমতী বলল, গেলে না যে?

বেন্দা হরিমতীর ওপর আছাড় খাওয়ার মতো পড়ল। তারপর
অন্ধকারে কিছুক্ষণ যুটোপুটির শব্দ। তারপর স্তব্ধতা। ^১ধাইরে মেঘের
ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। বেন্দা বলল, তোমাকে ছেড়ে এমন দিনে কোথায়
যাব বলো? তোমার সিঁথেয় সিঁদুর দিলুমই যখন, তখন তুমি আমার
বউ। বউকে ফেলে পুরুষমানুষ পালায়, না পুরুষ মানুষকে ফেলে বউ
পালায়? তুমি যেন পালিওনা হরিমতী, তাহলেই হল।

হরিমতীর বুকের ওপর মুখ গুঁজে থাকতে থাকতে বেন্দার ঘুম
আসছিল। হরিমতী তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বাবুর বাগান
বৃষ্টির মুখে গাছ-গাছালি কেঁপে উঠছিল। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে
হরিমতী ভাবছিল, কালই একসময় স্নেহে বৃষ্টি গয়নার বাকসোটা
তুলবে—বেন্দা যখন থাকবে না ত্রিসীমানায়, তখন।...

ভানুমতীর বিপদ

কমলাক্ষের বাড়িটা এক তলা। বারান্দায় বড় বড় থামা মধিখানে উঠোন
এবং তিনদিকে ঘর। নদীর পারে গ্রাম বলে উঁচু ভিটেয় ঘর বানানো
এই এলাকার রীতি। উঠোন থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে সিঁড়ি
বারান্দার নাথায়। সিঁড়ির ধাপে বসে আছে ঘোমটা টানা ভানুমতী।
আকাশ জুড়ে ঢুকরো নালের খোপে সাজানো সাদা মেঘের ডাকের
সাজ কমলাক্ষ বাড়ি ঢুকতেই কমলা ফললেন, চৌকিদারের বউ কী
বলছে শোনো।

কমলাক্ষের গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙি, খালি পা। হাত গাড়ু।
বাড়িতে পায়খানা আছে বটে, দেশজ অভ্যাস অনুসারে এখনও মাঠে
ঘাটে—বিশেষ করে ইটভাটায় কাজটা সেরে আসেন। জমিজমা

মুনিশের কাজও তদারক হয় সেই সুযোগে। গাছু রেখে কানের পৈতে খুলে মাজবার ভংগি করে বললেন, কী গো বউ ?

ভানুমতী ঘোমটার ফাঁকে বলল, চৌকিদারের অবস্থা খারাপ বাবুমশাই। অস্থলের ব্যারামটা বড্ড বেড়েছিল। আজ মধুপুর হাসপাতালের ডাক্তার বললেন, পেটের ভিতর গোটা হয়েছে।

কী হয়েছে ?

আজ্ঞে গোটা। বাঁকা চৌকিদারের বালিকা বধূ হাতের মুঠায় বুঝিয়ে দিল।

কমলাক্ষ একটু হাসলেন ! অ-টিউমার ! তা আমি কী করব বলোদিকি বউ ?

ভানুমতী রোগা মেয়ের স্বরে বলল, ডাক্তারবাবু বললেন, শহরের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। পেট কেটে গোটা বের করবে।

কমলাক্ষ বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসলেন। তা তো করবেই। তবে আমাকে কা করতে হবে। সেটাই বলো দিকি বউ ? আমি এক্ষুনি বেরুবো।

আজ্ঞে বাবুমশাই, টাকাকড়ি তো কিছু লাগবে। ভানুমতী বলল। তাই চৌকিদার বললে, বাবুকে গিয়ে বলো—কাটা দশেক জমি বন্ধক রেখে যদি শত্ৰুয়েক টাকা দেন...

কথা কেড়ে অস্থির হয়ে কমলাক্ষ বললেন, টাকা ? তোমার মাথা খারাপ ? এই তো ওমাসে মনোদাকে এককাঁড় টাকা দিতে হল। তার ওপর মঞ্জুর বিয়ের দিন পড়েছে এ মাসে। আমার ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখন তো টাকাকড়ি দিতে পারব না বউ !

কমলা থামে হেলান দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, হাসপাতালে তো টাকা লাগবে না গো ! টাকা কী করবে ?

ভানুমতী বলল, টাকা না দিলে ভর্তি করবে না গিন্নিমা।

হাসপাতালের কম্পাণ্ডার বাবু বলেছে ! টাকা না নিয়ে গেলে বলবে সিট নেই।

কমলাক্ষ বললেন, ছুঁনীতি! ছুঁনীতিতে দেশটা গোল্লায় গেল।
তুমি বরং সুখেনকে গিয়ে ধরো বউ। ওরাই তো এখন নেতা হয়েছে।

ভানুমতী বলল, বাবা রে বাবা! সুখেনবাবুর যা মেজাজ হয়েছে।
কাল কষ্ট করে লোকটা গিয়েছিল। উণ্টে ধমকা-ধমকি করেছে।
বলেছে, আমার অত সময় নেই। ভানুমতী ফৌস ফৌস করে নাক
ঝাড়তে থাকল।

কেন কেন? বলে কমলাক্ষ হাঁক দিলেন, পঞ্চা! এখানেই ছুঁবালতি
জল দে। চানটা সেরে নিই।

পঞ্চা বাবু-বাড়ির নতুন মাহিন্দার! জমি-জমা তদারক করে,
আবার বাড়িতেও খাটে। বেন্দা এ্যাড্বিন এ বাড়ি টিকতে পারলে
তারই মাহিন্দার হবার কথা ছিল। পঞ্চার সাড়া পাওয়া গেল টিউ-
বেলের হাতলের বিকট শব্দে। সে সভাবতঃ কথা বলে কম। কিন্তু
ভানুমতীর হয়ে ভাব দিল। ...সুখেনবাবু চটে যেয়েছে চৌকিদারের
ওপর। ...ধুপুরের চন্দ্রবাবুকে নাকি কী সব কথাবার্তা 'লাগান-ভাঙ্গান',
করেছে কবে। বিজ্ঞ পঞ্চা দাঁত বের করে সাসল। অজ্ঞের মশাই,
পাট্টাপাট্টির ব্যাপার।

পাট্টাপাট্টি অর্থাৎ রাজনৈতিক দলাদলি। কমলাক্ষ গোপ্তি তুলেছেন
ইতিমধ্যে। ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন কমলার উদ্দেশ্যে। কমলা বামীর
বর্মাক্ত গোপ্তি বা হাতের গদ্বুলে তুলে থামের কোনায় রাখলেন।
কাচতে দেবেন অন্নকে। অন্ন এখন দুধ ছুঁতে গেছে বাইরের গোয়াল-
ঘরে। দুধ চুরি সামলাতে মায়ের নির্দেশে মঞ্জু বাছুরের গলার দড়ি
ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবু চুপ। গম্ভীরমুখে আকাশ দেখছেন। কমলা কাচের সুদৃশ্য
পাত্রে খাঁটি সরষের তেল এনে ধাপে রাখলেন। তখন তেল মাখতে
শুরু করলেন। ভানুমতী মরীয়া হয়ে বলল, ধানের গুছি রোয়া আছে
জনিতে, বাবু। হেঁতাই তলার জমিখানা। এইমাত্র দেখে এলুম,
গুছিতে রঙ ধরেছে। আবুণ মাসে বান কেটেই জমি ছাড়িয়ে নোব।

কমলাক্ষ আনমনে বললেন, কাল একবার এস। ভেবে দেখি।

আশা পেয়ে ছটফট করে ভানুমতী বলল, এখন-তখন অবস্থা বাবু।
খড়কড় করছে সবসময়।

তা বললে কী হবে? কমলাক্ষ বিরক্ত হয়ে বললেন। আমাকে
ভাবতে হবে না? অতগুলো টাকা!

ভানুমতী আন্তে-আন্তে বেরিয়ে গেলে কমলা প্রশংসার সুরে
বললেন, চৌকিদারের বউটা খুব হিসেবী! এতটুকুন মেয়ে—নজুর
বয়সী। অথচ হাড়ে হাড়ে পাকা।

কমলাক্ষ ফিক করে হেসে গলা চেপে বললেন, সব ব্যাপারেই
পাকা। ফাঁড়ির সেপাইদের সঙ্গে যখন হাসাহাসি করে আর তাড়ি
পরিবেশন...

কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। কমলা বললেন,
তোমার শকুনের দৃষ্টি ওখানেও পড়েছে? মেয়ের বয়সী বউটা। ষিক
তোমাকে।

কমলাক্ষ সচক্ষে দেখেন নি। তাই কথা না বাড়িয়ে হাঁক দিলেন,
হল রে পক্ষী?

ভানুমতী তখন হনহন করে হাঁটছে। রাস্তার মাঝখানে পাঁক
জমেছে। গরু মোষের পায়ের ছাপ পড়ে আছে সারা রাস্তা। কিনারায়
একফালি গম্ভণ শুকনো পায়ে চলা পথ ধরে ভানুমতী বকুল গাছের
তলায় একবার দাঁড়াল। মোড়লপাড়ার বুড়োরা আড্ডা দিচ্ছে। কেউ
শণের দড়ি কাটছে। কেউ জাল বুনছে। মাঠঘাটের গল্প করছে।
ভানুমতীকে দেখে ঘোলাটে চোখে তাকাল একবার। ভানুমতী
সুখেনদের বাড়ি ঢুকল।

সুখেনের মা মোড়লগিন্নি বলল, কে গো মেয়েটা?

ভানুমতী আন্তে বলল, আমি চৌকিদারের ঘরের লোক, মা!
সুখেনবাবু নেই?

সুখেন? সে কি এখন বাড়িতে থাকে বাপু? মোড়লগিন্নি
নাতিকে কোলে তুলে নিল উঠোন থেকে। আংটো নাতির এক পায়ে

রূপোর সরু মল। সারা গায়ে ধুলো। ঠাকমার নাক চুষতে থাকল।
কখন দেখা পাব, মা ?

মোড়লগিগ্নি নাতির স্নেহে আপ্লুত। বললেন, মধুপুর ইস্কুলে আছে
স্নেহন।

ভানুমতী যেন পণ করে বেরিয়েছে, আজই টাকার হেস্তনেস্ত করে
মরদটাকে শহরে নিয়ে যাবে। হাসপাতালে ভতি না করিয়ে ছাড়বে
না। স্নেহনবাবু মেয়ে মানুষের কথায় যদি নরম হয়ে একটি বাবস্থা
করেন! কমলাক্ষ বাবু তো রইলেনই। নিম রাজি হয়েছেন বোঝা
যাচ্ছে। আশা—নিরাশায় তুলতে তুলতে ভানুমতী গোড়হর হয়ে
নদীর ধারে বাঁধে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে সাদা ব্রিজ বকবক করছে
উজ্জল রোদে। তার ডানদিকে হাইওয়ের ধারে মধুপুর বাজার ছবির
মতো দিগন্ত আঁকা রয়েছে। যাবে ভানুমতী ইস্কুলে! সে নাকচাপি
খুঁটতে থাকল হিজল গাছের ছায়ায়।

মনটা হঠাৎ দমে গেল। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হত। একা
যেতে কেন যেন বড় গা বাজছে। ভানুমতী ভাবল, মনা—ভাসুরের
মেয়ে সুরিকে ডেকে আনবে নাকি। কিন্তু সুরি কি বাড়িতে বসে আছে
এখন? হয়তো মায়ের সঙ্গে জাম পাড়তে গেছে বাগুড়ের দিকে। নয়
তো মাঠের আলো শাক তুলতে। রুটির জলে ছালিকে শাকের পাতা
ডাগর হয়েছে। মুসুর ডালে ছালিকে শাক—জিভে জল এসে যায়।

সেই সময় নদী থেকে বোপ ঠেলে বেরিয়ে এল বেন্দা! হাতে
ছোট মাটির ভাঁড়ে কেঁচো ভতি। সারগাড়ার কালো মাটির মধ্যে
কিলবিলে কেঁচো চূপ চাপ পড়ে আছে। বেন্দা এদিকে পিছন ফিরে
ছায়ায় বসে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল। খান দশেক বড়ঁসি
দিয়েছে নদীতে। দশ তাত অন্তর কক্ষির মাথা থেকে শনের শক্ত
স্নতো ঝুলছে বড়ঁসীতে কেঁচো গাঁথা। জলের স্রোত ছুঁয়ে বড়ঁসী তির
তির করে কাঁপছে মাছ নিখলেই জলের শব্দে সে টের পাবে।

বেন্দা বঁকড়া চুল থেকে আধখানা বিড়ি বের করে এদিক ওদিক
তাকিয়ে আগুন খুঁজতে থাকল। কাছাকাছি মুনিশ জন বা রাখাল

কাউকে দেখতে না পেয়ে নিরাশ হল। মধুপুরের জোলা পাড়া থেকে একটা লোক তাঁদের গামছা বেচতে যাচ্ছিল গাঁওয়ালে, তখন তার কাছে আগুন নিয়ে এই বিড়িটার আধখানা খেয়েছে। এখন বাকিটা খেতে মন ছটপট করছে।

ভানুমতীকে দেখেই বেন্দার চোখ নিস্পলক হয়ে গেল। চৌকিদারের বউ নিচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়লে ঘোমটাটা টেনে দিল। বেন্দা কথা বলবে, না বলবে না—তাই নিয়ে দোটানায় পড়ে গেছে। ভানুমতীরও একই অবস্থা। একটু করে বেন্দা সাহসে রসিকতা করে বলল, লোত্‌নী নেতুনা—(অর্থাৎ নতুন বউ, তার অপভ্রংশ) নাকি? ছাগল খুঁজে বেড়াচ্ছ তা ইথেনে তো এই বেন্দা ছাড়া আর কেউ নেই। বেন্দাকে যদি ছাগল ভাবো, বেঁধে নিয়ে যাও। তবে লেজ তুলে দেখো আগে।

তারপর খি খি করে অনেকটা হাসি। ভানুমতী রসিকতাকে পাত্তা না দিয়ে ছুঁখে তেসে বলল, দেওর কি বঁড়শী দিয়েছে নদীতে? পেলে কিচু?

এবার পাব। বেন্দা বলল। লেত্‌নীর মুখ দেখলুম। এবার পাবই পাব।

দেওরের খালি সব সময় ঠাট্টা। ভানুমতী বলল। একটা কথা বলব—রাখবে?

বেন্দা চঞ্চল হয়ে বলল, হুঁউ। বলেই দেখ না লোত্‌নী, কি বললে

আমার সঙ্গে একবার মধুপুর যাবে? সুখেন বাবুর ইঙ্কুলে।

বলল। একা যেতে বড্ড গা বাজছে।

বেন্দা উঠে এল বাঁধে। বলল, ব্যাপার কী বলোদিকিনি লোত্‌নী?

তোমার চৌকিদার দাদার অবস্থা ভাল না। ভানুমতী ইনিয়ে বিনিয়োগে আগাগোড়া শোনাতে থাকল। বেন্দার সঙ্গে এতদিন তার এতবেশি কথাবার্তা হয়নি। কদাচিৎ বেন্দা চৌকিদারের বাড়ি গেছে নানা খান্দায়। একেগারে অচেনা নয় পরস্পর। কিন্তু নিরিবিজিতে পরপর

এবং পরনারীর মধ্যে কথাবার্তা কেমন যেন দেখায়। গুরুতর না কিছু ঘটলে ভানুমতী অল্প কথা বলেই চলে যেত এখান থেকে।

সব শুনে বেন্দা বলল, বাঁকুদা বড় ভাল মানুষ। এতটা হয়েছে, তা তো জানতুম না। যে জিত চুক চুক করে দুঃখপ্রকাশ করল। ফের বলল, তোমাদের বাড়ি অনেকদিন যাওয়া হয়নি কি না। আমার শালা আজকাল যা কাজ পড়েছে। মুনিশ খাটছি—রোজ তারপর বেলা পড়লে মধুপুরে গিয়ে ধান্দা ঝরছি, বলবে ধান্দাটা কিসের? তেমাকেই বলছি লোত্‌নী—কাউকে বলো না। আনি রিকশা চালানো প্যাঙ্কীস করছি।

ভানুমতী বলল রেকশা? জানো দেওর, আমার মামাতো দাদা রূপপুরে রেকশা চালাত। হাঁপের অসুখ হয়েছিল। রেকশা ভালো না বাপু।

বেন্দা গ্রাহ্য না করে নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এগোও লোত্‌নী। বড়সীঙলায় একবার চোখ বুলিয়ে আসি। চাই কি, একটা আড় গঁেথে গেলে বাজারে বেচে আসব।

বলে সে দৌড়ে বাঁধ থেকে নেমে ঝোপঝাড় ঠেলে নদীর কিনারায় চলে গেল। ভানুমতি হাঁটতে থাকল। হাঁটে এবং পিছু ফিরে দেখে বেন্দা আসছে নাকি। বেন্দাকে তো বলা যাবে না। মধুপুরে আসল ভয় ফাঁড়ির পুলিশের হাসপাতালে মরদকে নিয়ে গিয়ে পাল্লায় পড়বি ভয়ে সে ঘোমটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে ছিল। ছোট্ট : এর পা চলে না, এমন অবস্থা। ওকে পিছনে ফেলে এগিয়ে খেঁওয়ার জন্ত বাঁকা বাড়ি ফিরে গাল মন্দ করে ছিল রাগের চোটে।

বেন্দা দৌড়ে সঙ্গ নিয়ে বলল, বড় শেয়ানা হয়ে উঠেছে নদীর মাছগুলো। লোত্‌নী বাড়ি এসে আমাকে কিন্তু এককিলো চাল দিতে হবে। একটি মুনিসের অর্ধেক মজুরি! না দিলে চলবে না বাপু। তোমাদের জমিজমা আছে। ঘরে চালের অভাব নেই।

ভানুমতী মনে রাগ করে সুখে বলল, অত পারবনা দেওর। এক কাঠা দেব।

ঠিক আছে। দেড় কাঠা দিও। বেন্দা রফা করল।—

হাইওয়ের এক দিকে বাজার, অগ্নিদিকে ধু ধু মাঠ! বাজারের আগেই মধুপুরে আদর্শ বিজ্ঞাপীঠ। পথে বেন্দা বেজায় বক বক করেছে। ভানুমতির সাড়াশব্দ নেই। একতাল্লা সারবন্দী তিনদিকে ঘর স্কুলের, সামনে ফুলবাগান। তার একধারে খেলায় মাঠ। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল ভানুমতী কৃষ্ণ চুড়ার ছায়ায়। এখনও লাল ফুলে দগদগে হয়ে আছে গাছটা। বেন্দা ভয়ে ভয়ে বারান্দায় উঠে এদিক এদিক তাকাচ্ছে। ভানুমতি চঞ্চল দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সুখেন ক্লাস এইটে ইতিহাস পড়াচ্ছিল। জানালা দিয়ে বেন্দাকে দেখে উদ্ভিগ্ন হয়ে বেরিয়ে এল। বাড়ি থেকে কোন খারাপ এনেছে ভেবেছিল। বলল, কী হয়েছে বেন্দা?

বেন্দা আচমকা তাকে সামনে দেখে ভড়কে গেল। দ্রুত আব্দুল হুসে গেটের কাছে ভানুমতীকে দেখিয়ে আমতা হেসে বলল, আজ্ঞে বাবু দাদা চৌকিদারের বউ আপনাকে দেখা করতে এসেছে।

অমনি সুখেন খাপ্লা হয়ে গেল—তা এখানে কী? গ্রাঁ? এখন দেখা করার সময়? অঞ্চল অফিসে আসতে বল্গে যা। নয় তো সন্ধ্যার পর বাড়িতে। তাঁদের আলায় দেখছি মরে গিয়েও রহাই পাবনা।

বেন্দা সভয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে।

ভানুমতী বাকুল হয়ে বলল, কী বললে, দেওর? কি বললে বাবু।

বেন্দা পা বাড়িয়ে গুম হয়ে বলল, শালার লাথ টাকার মেজাজ। বললে বিকেলে অঞ্চল অফিসে আসতে। নৈলে সনজ্ঞে বেলা বাড়িতে।

ভানুমতী চুপচাপ হাঁটতে থাকল। এবার মনে হচ্ছে চৌকিদার শুনলে গালমন্দ করবে। এমন করে বোকের মুখে এখানে আসাটা ঠিক হয়নি—তাছাড়া বেন্দার সঙ্গে এসেছিল শুনলে তো ক্ষেপে

যাব। বেন্দা যে নষ্ট মেয়ে বোষ্টুমীর সঙ্গে থাকে এতক্ষণে তাঁত্র হয়ে ধরা পড়ল মনে।

ভানুমতী মনে মনে মরদের উদ্দেশ্যে মাথা কুটে বলল, আমার মাথার ঠিক ছিল না গো, আমার মাথার ঠিক ছিল না। সারারাত অমন করে তুমি পড়া মাথায় করে যন্ত্রণায় কাঁদলে। আমি মেয়ে মানুষ—কী অত বুঝি বলো ?

বেন্দা বলল বাঁকুদা ওই সুখেনশালার ফরমাস খেটে হাল্লাক হয় নি ? আমি দেখিনি ? বোনের বিয়ের তত্ত্ব যাবে। তাও ওই চোকিদারকেই যেতে হবে। সনজ্জাবেলা কী ছুপুররাত—কোনো কাজ লাগলেই ডাক্ চোকিদারকে এখন কেমন রোয়াব দেখছ শালাদের ? পিথিমাটাই এমন। বুঝলে লোত্ নী ? ভালর কাল আর নেই।

বেন্দা দার্শনিক হয়ে গেল হাইওয়েতে। কান ঝালাপালা দিচ্ছিল ভানুমতীর।

নদীর ধারে হিজলতলায় পৌঁছে যখন ভানুমতী গোডহর হয়ে গাঁয়ে চলে গেল, তখন বেন্দার মনে পড়ল—আরে তাই তো ! এক রুষ্টির দিনে পুকুরপাড়ে ঝোপে লুকিয়ে এই মেয়েটারই গ্যাংটো শরীর দেখে পাগল হয়ে উঠেছিল সে।

বেন্দার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন খারাপ হয়ে গেল, কেন মাছধরার আনন্দভরা আশা, বাবুর বাগানে হরিমতার সিঁথের নিলাজ সিঁছুর এবং তার বুকে মুখে গুঁজে বেঘোর ঘুম কেন বড্ড বাজে ব্যাপার মনে হল, সে বুঝতে পারছে না।

ওবেলা গিয়ে চালটা যখন আনবে, ভানুমতীকে ভাল করে দেখবে বেন্দা।

হরিমতীর গয়নাগাঁটি

এতদিন বাদে অল্প এসেছিল বোনপোকে উদ্ধার করতে। বাবুর ছোটমেয়ের বিয়ে লেগেছে। বাড়িতে আত্মীয়কুটুম্বের খই ফুটছে।

বাবুর বাড়ি এখন কত কাজ। বেন্দা থাকলে এসময় বজ্ঞ ভাল হত। কীভাবে ভাল হত। কীভাবে ভাল হত অন্ন জানে না। কিন্তু মন বলছে, বেন্দাটা বাবু এবং বাবুর গিন্নির হাতনডিটা হতে পারত! আর সব মেয়ের বিয়েতে বেন্দা খুব খাটা-খাটনি করেছিল। সুনজরে পড়েছিল ওনাদের। মাহিন্দারি চাকরিটা প্রায় পেয়ে যাচ্ছিল, বেন্দার মতি টলল হটাৎ। ভাঁড়ার থেকে মুড়ি চুরি করে খেয়েছিল, সেটা কারণ হয়তো নয়—আসল কারণ খিড়কির পুকুরে মেয়েরা চান করার সময় বেন্দার ঈশানকোণের ঝাঁকড়া বটগাছের ডালে শোয়া অভ্যাস হতুনানের বরাবর। কোন মেয়ের চোখে পড়ায় গিন্নিমার কানে তুলেছিল। তাই নিয়ে সে এক অনাছিষ্টি সন্ধ্যাবেলা। বেন্দা আর ও-বাড়ি ঢোকেনি।

বাবুর বাগানের কাছে এসে নিচু পাঁচিলের ওধারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিষদৃষ্টে অন্ন হরিমতীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনেমনে একশো গাল শান দিয়ে ধারালো করতে থাকল।

হরিমতী এদিকে পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। বেন্দাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে অন্ন তৈরী হয়ে ডাকল চেরা গলায়। বেন্দা! বেন্দা আছিস? অ বিনোদ!

হরিমতী ঘুরতেই থ বনে গেল অন্ন। তার মনে হল স্বপ্ন দেখছে নাকি! হরিমতীর সিঁথেয় সিন্দুর, ভুরুর মধ্যে লাল টিপ মারমুতি হয়ে আছে। আর হরিমতীর গলায় সরু চেন, হাতে কলি, কানে তুল। অন্ন যখন সধবা ছিল, গোবিন্দের আমলে হরিমতীকে এরকম দেখেছে। সবচেয়ে অবাক লাগছে, তাহলে এত কষ্টের মধ্যেও বেচে খায়নি গয়না-গুলো? কোমরে চাঁদির বিছে অবশি নেই, পায়ের আঙুলের ঝুমঝুগি-গুলোও। অন্ন টের পেল, বেন্দা কোথায় আটকা পড়েছে।

গাল দেবে কী, হরিমতীর রূপান্তর দেখে অন্ন শুধু ভড়কে যায়নি, বুকের ভেতরে একটা কষ্ট ঠেলে উঠছে। বোকা অবুঝ বাপ-মাহারা ছেলেটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে কামরূপ-কামিখোর ডানি!

হরিমতী হাসছিল। ...তোমার বোনপো এখন থাকে? হরিমোড়-লের সঙ্গে শহরে গেছে। মোড়ল ডেকে নিয়ে গেল ভোরবেলা।

অন্ন চুপচাপ ঘুরল। অতদূর থেকে তেড়ে এসেছিল ঝগড়া করতে। পারল না। বেন্দা থাকলে নিশ্চয় পারত। হরিমতীর রূপ দেখে ভড়কে গেল। কী খেয়ে এমন গতির লেগেছে ওর? টাকাকড়ি পোতা ছিল নাকি? রাস্তায় যেতে-যেতে অন্ন নিরিবিজি মুখ খুলল। কেন এমন অদ্ভুত লোকে চোখের ওপর সহিছে? কেন এখনও হারামজাদীর চুল কেটে মাথা ঝাড়া করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না? আগের দিন হলে কবে এর একটা প্রচণ্ড প্রতিকার হ'য়ে যেত না কি?

শেষে চেষ্টায়ে বলতে থাকল, এ জংলা গাঁয়ের ধারাই যে এরকম। এখানে কি মানুষ বাস করে? সবাই বনের জন্তু, জন্তু, জন্তু! সারা পথ সে জন্তু জন্তু করতে করতে গেল।

অন্ন এমন বকবক বারোমাস করে। লোকের কানসওয়া। কেউ জিগ্যেসও করল না ব্যাপারটা কী বাবুর বাড়ির কাছে গিয়ে অন্ন চুপ করল। তারপর তার ননে ধাঁধা ঢুকল। বেন্দার সঙ্গে মন্তরটম্বুর পড়ে শাস্ত্র অনুসারেই কি 'স্মাঙা' অর্থাৎ বিয়েটা হয়েছে? তা নৈলে কোন সাহসে সিঁড়র পরে? নিশ্চয় শহরে গিয়ে মাকালার মন্দিরে-টন্দিরে পুরুতের মারফত ব্যাপারটা হয়েছে।

আর তা হয়েছে বলেই গ্রামে এই রহস্যজনক নৈশক বেন্দা-হরিমতীর ব্যাপারে। একটু পরে অন্ন বাবুবাড়ির কাজের মধ্যে ডুবে বেন্দাকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলল।

তখন হরিমতী বাঁকা মুখে আপনমনে হাসছে। অন্ন কোমরবেঁধে ঝগড়া করতে এসেছিল, তাতে কোন ভুল নেই! বেন্দা থাকলে ঝগড়া না করে যেত না। ভাগ্যিস বেন্দা নেই। হরিমতী ঝগড়াকাঁটিতে একেবারে আনাড়ি।

বাগান জুড়ে এখন জোরালো সবুজ চারপাশে। বেন্দার পোতা চারাগুলো লকলকিয়ে উঠে ঝাড় মেলেছে। জামগাছে জাম পেকেছে। পাখপাখালি গুটে খাচ্ছে। কলকলাচ্ছে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এসে ভয়ে ভয়ে পাঁচিলের ওপাশে পাকা জাম কুড়োয়। হরিমতী আপত্তি করে না। বেন্দা থাকলে ত্রিসীমানায় ঘেষতে দেয় না কাউকে। গাছে

চড়ে আঁকশি দিয়ে বাঁকিয়ে জাম পাড়ে এবং বুড়িতে করে ধুয়ে বেচতে যায় মধুপুর বাজারে। বেন্দা আজকাল কত ধান্দায় ঘোরে সারাটা দিন। মুনিশের কাজ না থাকলে মাছধরাটা তো আছেই। চুরি-চামারির ধান্দাটা ছেড়েছে বলে মনে হয়। আজ হরি মোড়ল গেছে ভোরবেলা শহরে ‘সালফেট’ সার আনতে। রিকশো করে এনে ব্রিজে নামাবে। বাকি পথটা বেন্দা মাথায় করে বয়ে আনবে। বেন্দা হরিমোড়লের পায়ে-পায়ে দুরছে। বলে গেছে, মোড়লগিনি তোমাকে ডেকেছে। যেতে যেন ভুলো না।

চিরদিনের সেই আলসেমিটা ছাড়তে পারছে না হরিমতী। যাব-যাচ্ছি করে বাগানের একোণা-ওকোণা দুরছে সকাল থেকে। অল্প যাওয়ার পর উত্তরের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে নদী দেখতে লাগল। ওই দেখা যাচ্ছে নদীর মাথায় উঁচু ঢিবির ওপর যুধিষ্ঠিরের কুঁড়েঘর। হরিমতীর অবাক লাগল, নেহাত ছুটো ভাত আর কয়েক গেলাস তাতির লোভে সারা গ্রীষ্মকালটা লোকটার সঙ্গে শুয়েছে। কাজটা উচিত হয়নি। পাপ-পুণের টনটনে জ্ঞান হরিমতীর এ জন্মে নেই। কিন্তু পৃথিবীতে কি আর শোবার মতো পুরুষমানুষ ছিল না? তার চেয়ে বাবুর সঙ্গে শুলে ভাল খেতে-পরতে পেত। মুশকিলটা শুধু এই যে বাবুর যেন সে-দিনকাল আর নেই। চোখের সে-নেশাও আর নেই। যদি এসে পড়েছে কখনও, ছুটো ফালতু রসের কথা বলেই কেটে পড়েছে। হরিমতী মুখ কুটে টাকা ধার কিংবা ছকাঠা চাল চেয়েছে, বাবু বলেছে —এতখানি জায়গা দিয়েছি বিনিপয়সায়, আবার এটা সেটা চাইছিস কোন মুখে রে? জায়গাটা বাবুর বাবা দিয়ে গেছে। পরের ধনে পোদ্ধারি!

আসলে যে-গতর দেখে পুরুষমানুষ পোকামাকড়ের মতো এসে ভল-ভলবে, সেই গতর কাট হয়ে গিয়েছিল হরিমতীর। বেন্দার নবীন বয়সের ঘষা লেগে তার গতর চেকনাই হয়েছে। লোকেরা টারা চোখে তাকিয়ে যায়। হেসে-হেসে রসের কথা বলতে যায়। হরিমতী মনেমনে বলে, এতকাল কোথায় ছিলি সব শালকুকুরেরা।

যুধিষ্ঠিরের চুড়োবাঁধা মাথাটা নদীর কিনারায় উঠতে দেখা মাত্র হরিমতী সরে এলো। থুথু ফেলল। তারপর দরজায় তাল। এঁটে আস্তে সুস্থে বেরুল।

হরিমোড়লের বাড়ির মেয়েরা তাকে দেখে মুখ টিপে হাসাহাসি করছিল। লজ্জায় হরিমতী লাল। বলল, অত হাসির কী আছে বাবু? গয়না কি কখনও পরিনি?

গয়না নয় বোষ্টুমী। হরি মোড়লের বড় ছেলের বউ সন্ধ্যা বলল। সিঁথেয় সিঁছুর পুরেছ—কবে তোমাদের স্মাঙা ল বলো দিকিনি?

হয়েছে সে-মাসে। বলে হরিমতী মোড়ল গিন্নির কাছে এগিয়ে গেল। মোড়ল গিন্নি দাওয়ার তক্তাপোষে বসে আছে। তাকে দেখে শুয়ে পড়ল। হরিমতী বলল, অ। তা আগে জানলে মালিশ বেঁটে নিয়ে আসতুম।

মোড়ল গিন্নি বলল, ব্রজেন কবরেজের কাছে মালিশ এনেছে। সাবধানে মালিশ করে দাও। দেখো যেন, ব্যাথা বাড়িয়ে দিও না।

দেয়ালের তাক থেকে মালিশতেল পেড়ে দিল। তারপর উপুড় হল মোড়লগিন্নি। কোমরের কাপড় সরিয়ে হরিমতী তেল মালিশ করতে লাগল। সেই ফাঁকে মোড়ল গিন্নি কথা বলতে থাকল হরিমতীর সঙ্গে। বন্দা যে ভাল মানুষটি হয়ে উঠেছে, তা আজকাল এর হাবভাবেই বুঝেছে মোড়লগিন্নি। আগে কেমন ধারা দৃষ্টি ছিল চোখের, দেখেই টের পেত কী মতলব নিয়ে ঘুরছে। ফাঁক পেলেই একটা কিছু নিয়ে পালাবেই পালাবে। গানছা হোক, গরু ডাকানো পাচন বাড়ি হোক, কিংবা একটা ঘটবাটি হোক। আজকাল মুনিশ খেটে রোজগারপাতি করছে। গতর চেকনাই হয়েছে। মোড়লগিন্নি বোঝে, এসবই তো বোষ্টুমীর কাছে যাওয়ার পর। ভালই করেছিস বোষ্টুমী ওকে জায়গাখানি দিয়ে। লোকে পাঁচকথা বলছিল—কী জানি, কবে না দুজনকার ওপর জুলুম করে তাড়িয়ে দিত গাঁ থেকে। তার চেয়ে স্মাঙা করে ধম্মত মাগ-ভাতার হয়ে আছিস, ভালই করেছিস। মোড়ল বলছিল বন্দা যদি সঙ্গে

থেকে মাঠঘাটে ঘোরে, এবছরটা আর হবে না—সামনে বছর মাহিন্দারী দেবে। বুঝিয়ে বলিশ বেন্দাকে।

হরিমতী ছোট করে হুঁ বলল।

মোড়লের মেয়ে টগর হাসতে হাসতে বলল, বেন্দাকে আটকে রাখতে পারবে তো বোঠুমী? শিকলি কেটে না উড়ে দেখো!

মোড়লগিল্লি খেঁকিয়ে উঠল।.....সকালবেলা তোর খালি অলঙ্কুনে কথা টগর।

টগর দমল না। চাপা স্বরে এবং চোখের ঝিলিক তুলে বলল, মনা বাউরি তোমাদের নিয়ে সঙের গান বেধেছে জানো?

মোড়লগিল্লি আরামে উপুড় হয়ে থেকে হেসে ফেলল। ... মনা ওই রকমই। কাল আউসের পাঁজায় গরু ডাকিয়ে মাড়ন দিচ্ছে আর আপন মনে গাইছে। শেষে বলে, তা অগ্নায় কিছু নয় বাপু। রাধিকার বয়স তো কেষ্ঠর চেয়ে বেশী ছিল। রাধা যখন যোবতী, কানাই তখন মায়ের কোলে দুধ খাচ্ছে

হরিমতী আস্তে বলল, কৈ, জাং মালিশ করে দিই।

তুই রাগলি নাকি বোঠুমী? মোড়লগিল্লি চিত হয়ে শুল।

হরিমতী হাসল শুধু।

মোড়লগিল্লি তার হাতের রুলি পরখ করে দেখে ছেড়ে দিল। আগের আমলের সোনা। না রে বোঠুমী? এমন গড়ন আজকাল আর স্মাকরার জানেই না। এই দেখ্ না, চুড়িগুলো কাঁ ছিরি কারছে।

হরিমতী বুঝল, তাকে টেকা দিতে গয়না দেখাচ্ছে মোড়লগিল্লি। দুহাতে দুগাছা করে সোনার চুড়ি। তার সঙ্গে মোটা পাত্তের দুটো রুলি। তার ওপর শাখা-নোয়া। বাহুতে অনন্ত। গলায় মস্তো চ্যাপটা হার। কানে ঝুমকো। ধানচাল খন্দের দর বেড়ে কয়েক বছরে হরিমোড়ল ফুলে উঠেছে। বউঝিদেরও গাভরা সোনা। হরিমতী মনেমনে রেগে গেছে। মুজফর ডাকুর চোখ কি তার মতো রাত কানা হয়ে গেছে? এবার যদি রাতবিরেতে এসে পড়ে, বলবে—

হরিমোড়লের বাড়ি সোনায়ে বলমল করছে। কিংকর বোরগী ঠিক এমনি করে মুজফরকে মুলুক-সন্ধান দিত। হরিমতী গুম হয়ে জাং মালিশ করতে লাগল।

মোড়লগিনি বলল, হ্যাঁ রে বোঠুমী! বাবুর মেয়ের বিয়েতে তোকে কাজে ডাকেনি?

হরিমতী মাথা দোলায়:

কেন রে? বাবুদের বাড়ি তৌদের পুরনো সম্পর্ক। মোড়ল গিনি একটু অগাধ হয়ে বলল। মঞ্জুর দিদিদের বিয়েতে ডেকেছিল, না ডাকে নি?

হরিমতী গলার ভেতর বলল, তখন ডেকেছিল।

টগর ফিক করে হেসে বলল, আর ডাকবে কেন? অন্নপুন্না থাকতে?

ফের হরিমতীকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা শুরু হল। বাড়িতে এক দঙ্গল বউ আর বালিকা। হরিমতী লাল হয়ে রইল রাগে ও লজ্জায়। গ্রাসলে গয়না পরে না এলে এতটা হত না। কাজ শেষ করে সে খিড়কির ডোবায় মাটি ও বুলি ঘষে মালিশের গন্ধ যতটা সম্ভব মুছে ফেলল। ফিরে এলে মোড়লগিনি বড় বউনাকে জুকুম করল, বোঠুনাকে ঢকাঠা চাল দাও। চাটি মুড়িও দেবে

হরিমতী মৃদুসরে বলল, গোটাকতক পেঁয়াজও দেবে বউ।

আঁচলে চাল এবং বুকের কাছে কোঁচড়ে পেঁয়াজ ও মুড়ি নিয়ে হরিমতী বেরুল। মেঘ ভেঙে রোদ উপচে পড়েছে। নিচু মাঠটুকু পেরিয়ে যেতেই দেখে, তার জামগাছে হুমুমানের পালের মতো ছেলে পুলে দাপাচ্ছে। ডাল ভেঙে একাকার করেছে। তলায় একদঙ্গল ভিড় করে কুড়োচ্ছে। হরিমতীকে দেখতে পেয়েই সাড়া পড়ে গেল। কাছে যেতে-যেতে ধূপ ধাপ করে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে পালাল সবাই। হরিমতী মুখ টিপে হেসে বলল, বাড়ি থাকলে তোমাদের দেখিয়ে ছাড়ত!

অর্থাৎ বেন্দা। বেন্দার ভয়ে বাবুর বাগানের কাছে ছেলেপুলে পা

বাড়ায় না। এখন মনে হয়, যখন এ বাগানে ভরস্তু যৌবনের মতো ফুলফলের গাছ ছিল, তখন বেন্দা থাকলে কত ভাল হত। কিন্তু তখন বেন্দা হয়তো নড়িহাতে রাখালী করে বেড়াত। সেও কি চুরি করে এ বাগানের ফলটা-মাকড়টা ভেঙে নিয়ে যায়নি? নিশ্চয় যেহে।

হরিমতী বেন্দার কথা ভেবে সুখে হাসল। বেন্দার কথা ভেবেই মোড়লগিম্মির মুখে শোনা মনা বাউরির সঙের গান বাঁধার কথা মনের ভেতর মুহূমুহু ঝিলিক তুলতে থাকল। কী গান বেঁধেছে মনা? রাধিকার চেয়ে কেউ বয়সে ছোট ছিল বটে। কিংকর বোরগী এসে বাগানে অনেকদিন পরে খোল বাজাচ্ছে। কেতনের এলোমেলো পদ বর্ষার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। অম্পষ্ট, ভাসা-ভাসা কিছু কথা। ছেঁড়াখোড়া বাসি ফুলের মতো কথা। আবেগে ছলতে ছলতে হরিমতী উড়ন্ত কথাগুলোকে ধরতে হাত বাড়াল। পারল না। স্মৃতির ভেতরে তোলপাড় হতে থাকল বোরগীর ছিলিমের নীল ধোঁয়া বৃন্দাবন কেলিকদম্ব বংশীধ্বনি ললিতা বিশাখা অলসখী। উলুনে ভাত চাপিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হরিমতী সুখের ধারা বইয়ে দিল রাতকানা চোখ ছটোতে।

বেন্দা এসে অবাক হয়ে যাবে গয়না পরা হরিমতীকে দেখে। আমগাছের তলায় কচি ঘাসের চাবড়া বসিয়ে মাটিটা ঠিকঠাক করে ফিরেছে। তাই টের পাবে না কোথায় লুকোনো ছিল এসব জিনিস! রূপোর বিছে আর পায়ের ঝুমঝুমিও পরবে হরিমতী।

মঞ্জু ও তার বর

মঞ্জু তার বরকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। তার বরের পরনে ঢোলা পাতলুন, নকসা আঁকা শার্ট, পায়ে গাফা জুতো, এবং মাথায় অমিতাভ-বচ্চন চুল। তার সরু গৌফ আছে। সে মহকুমা শহরের খন্দাব্যবসায়ীর ছেলে। বিদ্যায় মঞ্জুর সামান্য ওপরে। স্বস্তুর বাড়ি এসে খালি পালাই-পালাই করে। তবে মঞ্জুকে তার এত পছন্দ যে মঞ্জু যদি বলে,

ঘোড়া হও, পিঠে চাপি,—সে তক্ষুণি সবার সামনে উগুড় হয়ে হাঁট
ভাঁজে আপত্তি করবে না।

মঞ্জুরও বরকে বেজায় পছন্দ। বরের খাতিরে হিন্দি হিরোইন
সাজতে আপত্তি করে না। তার ওপর আছে মায়ের তাগিদ—যে
মা পূর্বীর মুখে রঙ মাখার নিন্দে করতেন। মঞ্জুরকেও গাফা জুতো
পরিয়ে ছেড়েছে বর। শহরে হাঁটতে যদি বা অসুবিধে হয় না তত,
গাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় পা বাড়ানোই কঠিন। তবু মঞ্জু পরেছে।

কমলাক্ষ বাড়িতে দুর্গাপূজা দেন। সেই উপলক্ষে জামাই-মেয়েকে
এনেছেন। নবমীর বিকেলে ভরা নদীর ধারে বাঁধের ওপর মঞ্জু তার
বরকে এটা-সেটা চেনাচ্ছিল। একটা গাছ দেখিয়ে বলছিল, ওতে
ব্রহ্মদত্তি থাকে। একটা লোককে দেখিয়ে বলছিল, ওর নাম মনা।
জানো? দারুণ সঙের গান বাঁধতে পারে ও? চৈতন্যক্রান্তির গাছনের
দিন এলে হেসে অস্থির হবে। আর ওই দেখতে পাচ্ছ, যুধোর কুঁড়ে।
খরার সময় ইয়া মোটা তরমুজ ফলায়। এবার খরায় পূর্বাদি—সেই গো
কলকাতার পূর্বাদি,...

বর বলল, হুঁ। বলো।

মঞ্জু অত্মদিকে মোড় ফেরাল কথার। ...ওই যে বাঁশবনটা দেখছ,
ওটা আমাদের। একবার ওখানে একটা অজগর সাপ খেঁকশিয়ালী
গিলে খাচ্ছিল।

বর বলল, খালি ফোটোয়েন্টি?

বরের হাসিতে চটে মঞ্জু বলল, বাবাকে জিগ্যেস কোরো। বাবা
বন্দুকের গুলিতে সাপটা মেরেছিলেন।

বর বলল, বাঘ নেই তোমাদের গাঁয়ে?

মঞ্জু হঠাৎ আনমনা হয়ে বলল, ছিল। তখন আমার জন্ম হয়নি।

কী হল?

মঞ্জু কিছু দেখছে। দেখতে-দেখতে সে নড়ে উঠল।—বাস্ বাস্!
এই, দেখবে এস—দৌড়ে এস!

বরের হাত ধরে টেনে মঞ্জু ধপাস ধপাস করে পা ফেলে দৌড়ুনোর
চেষ্টা করল। বর অবাক হয়ে বলল, ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?

মঞ্জু বলল, চৌকিদার বিরাট মাছ বিধিয়েছে! দেখবে এস না—
কী মজা!

একটু এগিয়ে নদীর পাড়ে ঝোপের ভেতরে আঙ্গুল তুলে বাঁকা চৌকিদারকে দেখাল মঞ্জু। বাঁকা তগির স্তূতো আঙ্গুলে জড়িয়ে মাছটা খেলাচ্ছে। কিন্তু ওই যাঃ! মাছটা ছেড়ে গেল! হতাশ বাঁকা এদিক-ওদিক ঘুরে পেছনে বাবুর মেয়ে-জামাইকে দেখে দাঁত বের করে হাসল।

মঞ্জু বলল, পারলে না তো, আটকাতে? তোমার দ্বারা কিন্ন্য হবে না চৌকিদার!

বাঁকা বলল, মাছটা বড় ছিল বাবুদিদি! বুঝলেন?

মঞ্জু আবার হাঁটতে লাগল বরকে নিয়ে। বলল, এই লোকটা আমাদের গাঁয়ের চৌকিদার। জানো? ওর পেট কেটেছিল হাস-পাতালে? মরেই যেত। বাবা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

বর হেসে বলল, তোমার বাবা ডাক্তারীও জানেন বুঝি?

ভ্যাট! মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল। বাবা সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে ভর্তি করত নাকি? কিন্তু তার চেয়ে মজার ব্যাপার, শোনো। লোকটাকে তো দেখলে! চুল পেকে গেছে। ওর বউকে দেখলে ভাববে—মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠল।

বর বলল, কী?

মঞ্জু বলল, বাবা বলেন বালিকাবধু। আমার মতো বয়েস! ওকে নিয়ে একটা দারুণ কেলিংকারি হয়েছিল। বলছি শোনো।

মঞ্জু ভাল করে বলার জন্য দাঁড়াল। ওর বর সিগারেট ধরাল তারপর বলল, কী?

মঞ্জু চোখে ঝিলিক তুলে বলল, চৌকিদার তখন হাসপাতালে।

আমাদের বি অল্পকে চেনো? অল্পর বোনপো বেন্দা সেই সময় বালিকা বধূর সঙ্গে ভাব জমাতে গিয়েছিল। বেন্দার গল্পটা আরও মজার। আগে এই গল্পটা শোনো। বেন্দা ছিঁচকে চোর। আমাদের বাঁশবন থেকে বাঁশ চুরি করে। কতবার হাতে নাতে ধরেছি। তো বেন্দা করেছে কী, চৌকিদারের বউকে রাত্রিবেলা—

মঞ্জু থি থি করে হাসতে লাগল। তারপর, বউটাতো ভারি চালাক। চৌকিদার হাসপাতালে গেলে মাসীকে এনে রেখেছে। একা থাকবে কী করে? তো বেন্দা দিনের বেলা চৌকিদারের বউয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে। তাই ভেবেছে, রাত্তিরে গিয়ে প্রেম করা যাবে চুটিয়ে।

বর আগ্রহ দেখিয়ে বলল, দারুণ গম্ভীর। তারপর, তারপর?

মঞ্জু গলা চেপে বলল, দাওয়ায় দু'মাছে দুজনে। বেন্দা গিয়ে ভুল করে মাসীর ঠ্যাং ধরে টেনেছে। আর মাসীও সাংঘাতিক মেয়ে খপ করে ধরেছে বেন্দা শালাকে।

ফের? এই! ও কী বলছ? বর জিভ কেটে একটা ভংগি করল মঞ্জুর মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে কথাটা।

মঞ্জুও জিভ কেটে বলল, হঁ। তো হয়েছে কী শোনো। চৌকিদারের টর্চটা মাথার কাছে ছিল।

টর্চ?

হঁ। অফিস অফিস থেকে না কোথেকে চৌকিদারকে টর্চ দেয় জানানো না? সেই টর্চ। চৌকিদার তো টর্চ নিয়ে হাসপাতালে পেট কাটতে—

বর বাধা দিয়ে বলল, বুঝেছি। তারপর?

মঞ্জু বলল, ভানু—মানে চৌকিদারের বালিকাবধু টর্চ জ্বলে দেখে বেন্দা! চেঁচামেচি শুনে পাড়া জেগে গেল। বেন্দা মাসী বুড়িটার হাতে কানড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে ততক্ষণে। পরদিন ফাঁড়িতে গিয়ে কেস করে এসেছিল। পুলিশের ভয়ে বেন্দা লুকিয়ে বেড়াত। শেষে এক রাত্তিরে বোষ্টুনীকাকীর ঘরে তাকে ধরে ফেলল।

বোষ্টুনীকাকী কে?

তুমি বড্ড ভুলো মন। কেন, অর্স্টমজ্জলায় এসেছিলে,—তখন আমাদের বাগানে নিয়ে গেলুম না তোমাকে? সেই যে মেয়েটা!

হঁ। মনে পড়েছে। বরের কিছু মনে নেই। তবু বলল।

বেন্দা শুকে বিয়ে করেছিল, বলেছিলুম না? মঞ্জু ফের হাসতে লাগল।—বয়সে বেন্দার ডবল।

মঞ্জু বলল, পুলিশ বেন্দাকে ধরে নিয়ে খুব মেরেছিল। শেষে বোষ্টুমীকাকী গয়নাগাঁটি বেচে অনেক টাকা খরচ করে ওকে ছাড়িয়ে এনেছে। বাবা বলছিলেন, রপকেস উঠলে ছ-সাত বছর জেল হয়ে যেত।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাবুর বাগানের কাছে চলে এসেছে। মঞ্জু আস্তে বলল, ওই দেখ—বোষ্টুমীকাকী দাওয়ায় বসে রয়েছে। বাবা বলেছেন, আর কিছুদিন যাক্। দেশের হাওয়া বদলালেই বাগান দখল করে ওকে তাড়িয়ে দেবেন। বাগানটা আমাদের কি না। দাচ্ছ মালী বসিয়েছিলেন—বোষ্টুমীকাকী সেই মালীর বউ।

মঞ্জু পা বাড়িয়ে ফের বলল, বাবা বাগানটা আমাকে-তোমাকে যৌতুক দেবেন।

বর বলল, বাঃ! দারুণ হবে। মাঝেমাঝে এখানে এসে স্মৃতি করব। একটা নৌকো কিনব। নদীতে ঘুরব। বাঃ!

মঞ্জু স্বপ্ন দেখার ভংগিতে বলল, ওই ঘরটা ভেঙে একটা ছোট্ট পাকাঘর বানাতে হবে কিন্তু।

সে আর বলতে? বর উৎসাহ দেখাল। পিকনিক করার উপযুক্ত জায়গা!

মঞ্জু ওর হাত ধরে টানল। চোখে ছুঁঁমি। এই! এস না। বোষ্টুমীকাকীর সাজ মজা করে যাই।

আগড় ঠেলে ঢুকলে হরিমতী বলল, দূর! দূর! যাঃ যাঃ!

চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাচ্ছ না আমরা কে? দূর দূর করছ যে বড়?

হরিমতী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে নিচে পা রেখে বসে আছে। হাতে একটা ছোট্ট লাঠি। অপ্রস্তুত হেসে বলল, অই গো! মঞ্জু নাকি? কবে এলে মা? খবর ভাল তো? একা এসেছ না বর এসেছে শুদ্ধু? এস—এস।

মঞ্জু থমকে দাঁড়াল। তুমি কি চোখে দেখতে পাচ্ছ বোষ্টুমীকাকী?

হরিমতী বিকেলের আকাশের দিকে মুখ তুলে একটু হাসল। ... কই গো। আমার চোখ দুটোর মাথা কবে খেয়েছি, জানো না বুঝি?

অন্ধ হয়ে গেছি মা ।

সে কী বোষ্টুমীকাকী !

হরিমতী বলল, হঠাৎ ও-মাসে ছপুরবেলা চোখ কটকট করে সে কী যন্ত্রণা । ক্রিমে ক্রিমে পিথিমী আঁধার হয়ে গেল । কত চিকিচ্ছে করানুম, আর চোখ ফিরে পেলুম না মা !

মঞ্জু বলল, বেন্দা তোমার কাছে থাকে তো বোষ্টুমীকাকী ?

অন্ধ হরিমতী হাসল ।...থাকে বৈকি মা । যাবে কোথা ?

মঞ্জু নরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, বেন্দা কোথায় বোষ্টুমীকাকী ?

হরিমতী লাঠিটার মাথার দিকটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে হাতে চিবুক রেখে আস্তে বলল, হরিমোড়লের পাট কাচতে গেছে দোহালিয়া বিলে । জোসনা উঠবে তো ? অনেকটা রাত অন্ধি এক কোমর জ্বলে দাঁড়িয়ে পাট কাচবে । সকাল থেকে ছপুরঅন্ধি ধানজমিতে নিড়ান দিয়েছে । বারণ করলুম, অত খেটে মারা পড়বে যে ! শুনল না । পাট কাচতে গেল । তো বিলের জলে বাবু বড্ড জেঁকের উৎপাত ।

মঞ্জু হঠাৎ হাসল । দেখো বোষ্টুমী, বেন্দাশালা শেষপর্যন্ত তোমাকে ফেলে পালায় না যেন ।

বলেই দুরল । ওর বরের খারাপ লাগছিল । এগিয়ে গিয়ে আগড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নদী দেখছিল । মঞ্জু ফের বলল যেতে যেতে, চলি বোষ্টুমীকাকী !

হরিমতী আগের কথাটার জবাবে একটু হেসে বলল, পালিয়ে গেলে যাবে । বাগানটুকুন রেজেষ্টারি করে দেব ভেবেছি আজকালের মধ্যে । চলে গেলে পাবে না ।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জু চাপা গলায় বলে উঠল, তোমার চৌদ্দপুরুষের বাগান । খামো, বলছি বাবাকে গিয়ে । রেজেষ্টারি বের করে দিচ্ছে !....

বাবুর বাগানে জ্যোৎস্না

শরৎকালের জ্যোৎস্নায় বলমল করেছে বাবুর বাগান । বেন্দা এসে দেখল, হরিমতী দাওয়ায় তেমনি বসে আছে । মশা মারছে চটপট শব্দে ।

বেন্দা বলল, হেরিকেনটা রেখে গেলুম পিঠের কাছে। দেশলাই পর্যন্ত।
জ্বালতে পারো নি ?

হরিমতী বলল, কী হবে ঘামোকা তেল পুড়িয়ে ? আত্মা তেল !

বেন্দা রাগ করে বলল, আত্মা-শস্তা আমি বুঝব। তোমার কী ?

একটু পরে সে হেরিকেন জ্বালে দাওয়ার কোনায় শিকেয় ঝোলানো
ভাত-ভরকারীর হাঁড়ি নামায়। দুটো টিনের খালায় ভাগাভাগি করে
নিয়ে ডাকল, এস। ভাত খাই।

হরিমতী বলল, তুমি খাও। আমি খাচ্ছি।

বেন্দা এসে ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে দাওয়ায় বসিয়ে দিল।

বলল, তোমার কী হয়েছে বলোদিকিনি ?

হরিমতী বলল, কিছু হয় নি।

বেন্দা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল।...চোখ গেছে ভো কী
হয়েছে ? রাগ করে থাকলে দিষ্টি আসবে ? খাও।

সে খালাটা ঠেলে হরিমতীর হাতে ঠেকিয়ে দিল ! হরিমতী অগত্যা
বলল, হাত ধোব জল দাও।

জল গড়িয়ে দিল বেন্দা। হাত ধুয়ে হরিমতী মুখে ভাত তুলল।
বেন্দা হাসতে হাসতে বলল, খাইয়ে দিতেও পারি। তুমি কতসময়
আমাকে খাইয়ে দিয়েছ না ?

ভাত খেতে-খেতে বেন্দা মাঠঘাটের গল্প করতে থাকল। তারপর
বলল, শালা কী জেঁক হয়েছে মাইরি ! একপো রক্ত শেষ করেছে।
কেরাচিন মেখে গেলুম অতটা। তবু গেরাহি করলে না, চিনচিন
করছে এখনও।

হরিমতী বলল, সর্ষের তেল মালিশ করে দোব।

হাঁড়িকুঁড়ি ঘরকন্না সামলে বিড়ি জ্বালল বেন্দা। হরিমতীর মুখেও
গুঁজে দিল। তারপর বলল, হরিমোড়লকে বললুম জানো ? বাবু খুব
শাসাচ্ছে উচ্ছেদ করবে বলে। মোড়ল বললে, আমরা আছি না মরে
গেছি ? বাবু অন্ধ্যায় করবে আর গাঁয়ের লোকেরা বসে-বসে দেখবে ?
আইন নেই ? গরমেণ্টো নেই ?

হরিমতী চুপ করে রইল।

বড্ড মশা হয়েছে। তাই তান্নিদেওয়া মশারিটা খাটিয়ে শুতে হয়।
হাওয়াবাতাস বন্ধ। গরম পড়েছে আবার। দাওয়ায় মশারির ভেতর
উপুড় হয়ে শুয়েছে বেন্দা। হরিমতী তেল মালিশ করে দিচ্ছে। বেন্দা
আরামে চুপ করে আছে।

কতক্ষণ পরে হরিমতী তার মুখের কাছে ঝুঁকে ডাকল যুমুলে ?

উ ?

একটা কথা বলব ?

বেন্দার যুম পাচ্ছিল। বলল, কী ?

তোমাকে বাগান রেজিষ্টারি করে দেব। তুমি পালিয়ে যাবে না তো
আমাকে ফেলে ?

যুম চটে গেল বেন্দার। যুরে চিত হয়ে বলল, পালিয়ে যাব ?
তুমি বড্ড নেমকহারাম মেয়ে মাইরি। ধ্যাৎ !

হরিমতী ওর বুকে মুখ গুজে বলল, আমি অন্ধ হয়ে গেলুম। তুমি
চলে গেলে আমার বড় কষ্ট হবে।

বেন্দা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তোমার মাইরি
খালি ওই কথা ! দেখ হরিমতী, সেই যে তোমাকে নদীর তলা থেকে
একরকম কুড়িয়ে আনলুম—তুমি আমার পায়ে কেরাচিন মালিশ করে
দিলে, তখন থেকে তুমি আমার মাও বটে, বউও বটে। হ্যাঁ—
আমি জানি, আমার মা বলতেও তুমি, বউ বলতেও তুমি। আর ই
সংসারে আমার আছোটী কে ? শোওদিনি চুপচাপ। যুম পাচ্ছে
বড্ড !

হরিমতীকে সে জোর করে শুইয়ে দিল। ফের বলল, তুমি যদি
বাঁচবে, বাবুর বাগান ছেড়ে কোথাও যেয়ে শান্তি পাবে না বেন্দা।

অন্ধ হরিমতীর বুকে মুখ গুজে বেন্দা শুয়ে রইল। হরিমতী তার
পিঠে হাত বুলোতে থাকল। বাবুর বাগানে জ্যোৎস্নায় পোকামাকড়
ডাকতে থাকল।

॥ नन्दन कानन ॥

যোগেশ্বর সেদিন বিকেলে তাঁর কলকাতার নাতনী শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুনোর কয়েক মিনিট পরে বাড়িতে চোর ঢুকল।

চোরের সংখ্যা দুই। একজনের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বছর। চুলে বেশ পাক ধরেছে। বেঁটে-খাটো, ঈষৎ নাচুসমুচুস গড়ন। চোখ দুটো সব সময় চঞ্চল এবং চোখের ওরা পিঙ্গল বর্ণ। মাথার চুল খুঁটিয়ে কামানো। পরনে ঢোল থাঁকি হাকপেন্টুল, পায়ে কালো ক্যান্ডিশের জুতো। গায়ে ছাইরঙা স্পোর্টস গেম্জি। কাঁধে বড়সড় একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। আর ডান হাতে একটা ছোট্ট সরু লোহার শিক। ওই দিয়ে অনেক জটিল তালা সে খুলেছে এ যাবৎ।

দ্বিতীয় চোর বয়সে নবীন। পঁচিশ বছরের বেশি নয়। তার পরনে একদা-জনপ্রিয় নর্দমা-পাতলুন। পায়ে জুতো-টুতো নেই। গায়ে ময়লা বাদামী হাকশার্ট। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সে বেজায় রোগা। একটু কুঁজো হয়ে হাটে। মুখখানা ডিমালো, ভারি অমায়িক। তার কান দুটোও একটু লম্বাটে। চোখ দুটো ছোট্ট, কুতকুতে। গর্তে বসা। তলায় কালচে ছোপ। কিন্তু ফিক করে হাসলে তাকে ভারি ভালমানুষ দেখায়। তার কাঁধে একটা কালো-রঙের কিটব্যাগ রয়েছে। পলিথিনের এই ব্যাগটা সে নিশ্চয় পয়সা ধরচ করে কেনে নি।

যোগেশ্বরের বাড়ির দিকে এই দুই চোরের অনেক দিনের নজর ছিল। এমন কী প্রোঢ় চোরটি একবার তাঁর কাছে চাকর-বাকরের কাজও চেয়েছিল। যোগেশ্বর কড়ামুখে বলেছিলেন, দরকার নেই। তিনি তত আরামপ্রিয় মানুষ নন। এই পঁয়ষাট বছর বয়সে তিনি বেশিরভাগ কাজ নিজের হাতে করে থাকেন। শুধু রান্নার জগ্গে

অনেক বছর ধরে ভণ্ড নামে কটক জেলার এক নিরীহ ও বিনীত বামুন ঠাকুর রেখেছেন। এসব কারণে এক নম্বর চোর কোনো সুবিধে করতে পারেনি।

গত তিনদিন এবং প্রায় তিনরাত্রির দুই চোর মরীয়া হয়ে একটানা বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করছে। যোগেশ্বর বাড়ি থেকে কদাচিৎ বের হন। বের হলে সজাগ ভণ্ড তো থাকেই। সে শুধু ঠাকুর-কাম-চাকর নয়, মালীও বটে। যোগেশ্বরের বাড়ি ঘিরে প্রায় একটা নন্দন কানন রয়েছে। রঙবেরঙের দিশি বিদিশি ফুলের গাছ, লতাবোপ, গাছপালা কতরকম। যোগেশ্বরের এই একটা প্রচণ্ড নেশা। বছর দশেক আগে পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করার কিছুদিন পরেই গিল্লি স্বর্গগতা হন। একটি মোটে ছেলে। সেও পুলিশে ঢুকে বড় অফিসার হয়েছে। কলকাতার লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগে আছে। যোগেশ্বর এই মফস্বল শহরের একটেরে নদীর ধারে নিরালায় বাড়িটা বানিয়েছিলেন। তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন বলতে এটুকুই ছিল।

গতকাল বিকেলে যোগেশ্বর তাঁর গাড়ি নিয়ে একবার বেরিয়েছিলেন। তখন দুই চোর বাড়ির পিছনে নদীর পাড়ে বোপের ভেতর বসে ধূর্ত শেয়ালের মতো উকি মারছিল। কিন্তু ভণ্ডকে বাড়ি ঘিরে সতর্ক এ্যালসিশিয়ানের মতো ঘুরপাক খেতে দেখে চোরদ্বয় বুঝেছিল, এটাই কর্তাবাবুর নির্দেশ এবং ভণ্ডর গায়ে জোর না থাকলেও গলার জোরের কথা তাদের জ্ঞান। এমন রামচাঁচানি টেঁচাতে এ শহরে ভণ্ডর জুড়ি নেই।

চোরদ্বয় তবু আশায় ছিল। কিন্তু মিনিট দশেক পরেই যোগেশ্বর ফিরে আসেন। সঙ্গে এক সুন্দরী যুবতী। তাকে দুই চোর অনেকবার দেখেছে। জানে, ও হচ্ছে লালবাজারের ধুরন্ধর এক গোয়েন্দা অফিসারের মেয়ে। ওর নামটাও তাদের অজানা নয়। যোগেশ্বর তাহলে নাতনিকে আনতে রেলস্টেশনে গিয়েছিলেন। এই নাতনিটি বড় চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে।

স্বভাবত চোরেরা বড় মুষড়ে পড়েছিল। তবু আশা ছাড়েনি। সেই আশা পরদিন বিকেলে আশ্চর্য সৌভাগ্যে সফল হয়ে গেল। যোগেশ্বর নাতনিকে নিয়ে বেরুতেই এক অভাবিত ঘটনা ঘটল, যা চোরদ্বয় কোনো দিন ভাবেনি। ভগুর রকম সকম এতদিন পর্যবেক্ষণ করেও আঁচ করতে পারেনি যে এমন নিরীহ বয়সী লোকের একজন প্রেমিকা থাকতে পারে।

প্রেমিকাটি আর কেউ নয়, রঘুনাথ উকিলের বাড়ির বি—যাকে সবাই বলে পাঁচুর মা।

পাঁচুর মা-ও হয়তো কোথাও ওৎ পেতে ছিল। তাকে রাস্তায় যেই দেখা, ভগু ঠাকুর লাজুক হেসে এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে কাছে চলে গেল। হ্যাঁ, তাল্লা এঁটেই গেল সে। একটু পরেই হুজনে সিঙ্গিদের আম বাগানের ভেতর দিয়ে পোড়ো ইঁটভাটার জঙ্গলে ঢুকতেই হুই চোর পিছলে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। নদীর দিকের গেট অনায়াসে খুলে বাগিচায় ঢুকল। তারপর পিছনের বারান্দার দাঁড়িয়ে ঝটপট চারদিক দেখে নিয়ে অপূর্ব কারিগরি কৌশলে জানলার ফাঁকে শিক গলিয়ে ছিটকিনি তুলল।

প্রোঢ় চোর ফিসফিস করে বলল, ভূতো! সামনে যা বাবা।

যুবক চোর বলিল, গতিক বুঝলে কেসে দেব মামা।

ছবার কাসিস। বলে প্রোঢ় চোর ব্যাগ থেকে লোহাকাটা যন্ত্র বের করল। যুবক চোর ভূতো সাঁৎ করে বাড়ির পেছন ঘুরে গিয়ে কোণার দিকে দয়ালে পাইপের পাশে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। সে কলের পুতুলের মতো একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দৃষ্টি ফেলতে থাকল। ওদিক থেকে তখন চাপা কটর কটর ঘস্ ঘস্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। তারপর এপাশের একটা দরজা খুলে মামা চোর উকি মেরে ডাকল, চলে আয় ভূতো! অনেক মাল। একা নেওয়া যাবে না। উদ্বিগ্ন মুখে ভাগ্যে চোর ভূতো বলল, ঘাঁটি আগলাবে কে মামা? যদি ভগা ফিরে আসে?

মামা দাঁত মুখ থিঁচিয়ে বলল, চলে আয় বলছি হতভাগা।

ধমক খেয়ে ভাগে ঘরে ঢুকল। এই ঘরেই উদ্ভিষ্ট মাল রয়েছে। সেই কবে যখন মামা চোর পুরানো খবরের কাগজ কিনে বেড়াত, তখন দেখে গিয়েছিল। কাচের আলমারিতে সাজানো কয়েকটা রূপোর বাসন আর অনেকগুলো ব্রোঞ্জ ও পিতলের মূর্তি—সেগুলো শিল্পদ্রব্য। নানা জায়গা থেকে এসব জিনিস সংগ্রহ করা এক সময় বাতিক ছিল যোগেশ্বরের। একটা আলমারিতে সেকেলে কাঁসার তৈজসও রয়েছে। দুই চোরের খলি প্রায় ভর্তি হয়ে গেল।

তারপর দুজনে ঢুকল ড্রয়িং রুমে। যোগেশ্বর যৌবনে নামকরা খেলোয়াড়ও ছিলেন। অনেক সোনা রূপোর পদক এবং হরেকরকমের ট্রফি পেয়েছিলেন। সেগুলো অতিথিদের চোখে পড়ার মতো করে সাজানো হয়েছিল। দুই চোর লুঠেপুঠে ব্যাগে ঠেসে ভরল সব।

ভুতো বলল, মামা, সোনার ঠাকুর নেই?

মামা চোখ পাকিয়ে বলল, থাম্ বাপু। আর কী আছে, দেখতে দে।

আলো জ্বালি মানা। অন্ধকার যে।

খবদার! মামা ধমকাল! তুই এবার ঘাঁটিতে যা। জ্বার কাসবি কিছু দেখলে।

ভাগে বেরিয়ে গেল। ভারটা তার পক্ষে একটু বেশি হয়েছে। কুঁজো গতর আরও কুঁজো হয়ে গেছে। পা ফেলতে পা টলছে। গায়ে তত জোর নেই। এ বয়সে তিন বেলা পেটপুরে ভাল রকমের খাবারটা জোটে না বলেই এ অবস্থা। সে ভাবছিল, এখন দৌড়তে হলে কেলেঙ্কারি হবে। সেবারকার মতো রামপাঁদানি বরাতে জুটলে আর মামা বলে ডাকবার সময় পাবে না। করুণ মুখে সে দেয়ালের পাইপ ঘেঁষে ধূপ করে বসে পড়ল। দাঁড়ালে লোকের চোখে পড়ার ভয়টা এখন তাকে পেয়ে বসেছে।

যোগেশ্বর সেবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুলিশী কৃতিত্বের দরুন একটা সুন্দর তাম্রফলক উপহার

পেয়েছিলেন। ফলকে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র বই থেকে নেওয়া দু'লাইন শ্লোক খোদাই করা আছে। যোগেশ্বরের বড় আদরের বস্তু এটি। যখন-তখন একবার করে সামনে দাঁড়িয়ে জলদগন্তীর স্বরে শ্লোকটি পাঠ করেন। ভাবগদগদ হয়ে ওঠেন। এসময় ভগু ঠাকুর কাছাকাছি থাকলে সেও করযোড়ে প্রণাম করে বসে। ভাবে, না জানি কোন দেবতার নিদর্শন।

মামা চোর ফলকটা দেখতে পেত না, যদি না এ ঘরের জানলার ফাটল দিয়ে নদীর ওপারের ঢাল খাওয়া সূর্যের ক্ষীণ একফালি সূচের মতো আলো এসে সোজা ওটার গায়ে পড়ত।

সে হাত বাড়িয়ে সেটা ফাউয়ের মতো গ্রহণ করল। তারপর বেরিয়ে গেল। দরজা ভেজিয়ে দিতে ভুলল না।

তখনও ভগুর পাত্তা নেই! দুই চোর যেদিক থেকে ঢুকেছিল, সেই দিকেই বেরুল। নদীর ঢালু পাড়ে ঘন ঝোপ জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। সূর্য ওপারের বাঁশবনের ভেতর সবে নেমেছে। মাথার ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এক ঝাঁক কাক চলে গেল। ওপাশে খেলার মাঠের দিকে একটা গাধা লম্বা ডাক ছাড়ল। দুই চোর জলের ধারে গিয়ে শহরের দিকটা দেখে নিল। তারপর উণ্টো-দিকে হাঁটতে থাকল খুব সাবধানে পা ফেলে! ঢালু মাটিতে জলের ধার ঘেঁষে ঘন ঘাস গজিয়েছে! কিন্তু তলার দিকে নালি। ধসে গিয়ে অগাধ জলে পড়লে কেলেংকারি হবে।

এদিকে কোন বসতি নেই। মাইলটাক শুধু দুই ক্ষেত, ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালা। তারপর জেলে বসতি আছে একটা। ভাগ্যে বুঝতে পারছিল না মামা কোথায় চলেছে। কিট ব্যাগটা বেশ ভারি হয়েছে তার পক্ষে। জেলে বসতি সামনে উঁচু পাড়ের ওপর। নিচে নদীতে কয়েকটা ছোট্ট নৌকো দেখা যাচ্ছে শেষ বেলার ধূসর আলোয়। ঘাটে একটা মেয়ে আপন মনে কাপড় কাচছে অবেলায়। দুটো হ্যাঁটো ছেলেমেয়ে আর একটা নেড়ি কুকুর ঘাটের মাথায় খেলায়

মেতে আছে। মামা চোর বলল, হুঁ। এখানে বসা যাক বাবা।
আয়, এবার ধুঁয়ো টানি। জিরিয়ে নিই খানিক।

ঝোপের ভেতর একখানে ফাঁকা একটু জায়গায় নরম ছুঁবা
গজিয়েছে। চৈত্রের মাঝামাঝি সময় এখন। গরম দিনে দিনে
বাড়ছে। তবে নদীর বুকে হু হু হাওয়া দিচ্ছে বলে সেটা টের পাওয়া
যায় না। ঝোপঝাড় কোথাও কোথাও বুনো ফুল ফুটেছে। তার
গন্ধ মউমউ করছে। জিরিয়ে নিতে ফুসরৎ পেয়ে এবং বিড়ি টানার
আনন্দে ভুতো নাক উঁচু করে শুকে বলল, গন্ধটা বেশ মামা।
দারোগাবাবুর বাগানে তখন কেমন গন্ধ পাচ্ছিলুম এ গন্ধটা তার চেয়ে
ভালো।

মামা বিড়ি জ্বলে সম্মেহে বলল, দারোগাবাবু কী রে? যখন ছিল,
তখন ছিল। এখন অস্টরস্তা। টোঁড়া সাপ।

ভুতো ওই বিড়িরই ভাগ পাবে। কুতকুতে চোখে তাকিয়ে দেখছিল
মামার টান। হাতের আড়ালেই টানছে মামা। ভুতো দাঁত বের
করে বলল, মামা!

কী রে?

আমরা কোথায় যাচ্ছি গো?

মামা রহস্যময় হাসল। সে এক নিরিবিজি জায়গা। গিয়ে
দেখবি' খন।

ভুতো একটু চুপ করে থেকে ফের দাঁত বের করল। ও মামা।
অনেক দূর বুঝি?

হুঁ। একটু দূর বই কি। মাইল সাত-আষ্টেকের কম নয়।

ভুতো আঁতকে উঠল।...ওরে বাবা। অতদূর?

মামা ভাগ্নের হাতে জ্বলন্ত বিড়িটা দিয়ে নরম গলায় বলল, ভাবছিস
কেন? ওই দেখ নৌকো, আমরা একটা নৌকো নেব। একটুখানি
অপেক্ষা কর না।

ভুতো চোঁ চোঁ করে কয়েক টানে বিড়ির স্মৃতি পার করে দিল।
তারপর ধোঁয়া ভরা গলার ভেতর থেকে বলল, নাও।

মামা ফৌক ফৌক শব্দে শেষ স্লুথ টান টেনে হাসল।...আর নেই কিছু। বরাত খুললে অবশি দেখবি, আমরা সিগারেট খাব। তা'পরে জানিস ভুতো? বহু দিনের ইচ্ছে, একটা মেকানিকসের দোকান খুলি। রাধুবাবুর গ্যারেজ ঘরটা দেখেছিস্ তো? খালি পড়ে আছে। পঁচিশ টাকা ভাড়া চায়। শালা কেপ্লনের ধাড়ী! দেখা যাক। অনেক যন্ত্রপাতিও কিনতে হবে, বুঝলি ভুতো?

ভুতো সায় দিয়ে বলল, তা তো হবেই!

পা ছড়িয়ে আরামে চোখ বুজে মামা বলল, সাইকেল রিকশাই সারব বেশি। তার কাঁকে দু-একটা সাইকেল। তুই সঙ্গে থাকলে আমাকে আটকায় কে? তুইও তো বাপু নিকর্মা নোস। এসব কাজ ভালই জানিস।

জানি। ভুতো হাসল। রজব আলির শিক্ষা, মামা। তবে শালা কথায় কথায় ঠেঙাত। নৈলে লোকটা পাক্কা মিস্তিরি ছিল, মামা।

মামা বলল, আর আমার বরাতটা দেখ্ ভুতো। চিরটা কাল এঘাটে এঘাটে হন্তে হয়ে ঘুরলুম। কত কাজ না শিখলুম। অথচ 'পারমানেন্' হয়ে বসতে পারলুম না কোথাও। জানিস, কলকাতায় চিৎপুরে বছর খানেক হারমোনিয়াম সারাতুম। মালিক শালা এক মাল মাইরি! খামোকা চোরের বদনাম দিয়ে পুলিশে দিলে! জেল পর্যন্ত খাটালে।

তুমি জেল খেটেছ মামা? ভুতো চাপা গলায় বলে উঠল। জেল কেমন জায়গা গো?

যাবি নাকি? থিকথিক করে হাসতে থাকল মামা। জেল জায়গাটা মন্দ নয়, বুঝলি? তবে বড্ড একঘেয়ে লাগে। আর শালা যত সব হারামজাদা দাগীরা পা টেপায়!

কী খেতে দেয় গো?

খঁচুড়ি। কখনও ছুমুঠো কাঁকর মেশানো মোটা চালের ভাত। ফ্যানস্ক্র।

তরকারি দেয় না?

একটুখানি ঘাঁট দেয়। আলুনো। তবে ঘড়ির টাইম মতো খাওয়া

তো। আমার হেলথটা ভালই হয়েছিল রে ভুতো। গায়ে অনেক মাস ধরেছিল।

আমি জেলে গেলে খুব মোটা হয়ে যাব—তোমার মতো।

ভুতো হাসতে লাগল হি হি করে। মামা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওপরে পাড়ের দিকে তীব্র আলো বলসে উঠল। আলোটা নদীর জলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর নিভে গেল।

দুজনেই মাটিতে উবুড় হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর মামা ফিসফিস করে বলল, মোটর গাড়ি রে ভুতো। নড়িস না। দেখতে পাবে।……

যোগেশ্বর গাড়ি থেকে নেমে বললেন, শমু! এই হচ্ছে ম্যাকফারসান সাহেবের কুঠিবাড়ি, নাইনটিনথ্ সেক্সুরিতে এখানেই ছিল ডিস্ট্রিক্টের সেরা সিন্ডিকেটার। তখন গঙ্গায় জাহাজ চলত। ওই দেখছ, ভাঙা গেট মতো জায়গা আর সিঁড়ি। ওটাই ছিল জাহাজ ঘাটা। চলো, ওখানটা দেখিয়ে আনি তোমাকে। পাশেই সায়েবের কবর আছে।

শর্মিষ্ঠা বলল, কুঠিবাড়ি বললে। কিন্তু কোথায় কুঠিবাড়ি? খালি তো জঙ্গল।

যোগেশ্বর হাসলেন।...এখন জঙ্গল। একশো বছর আগে এখানেই ছিল বিশাল এক প্রাসাদ। গঙ্গার ধারে ধারে যে রাস্তায় আমরা এলুম, ছেলেবেলায় তার অগ্নি চেহারা দেখেছি। এখন হাইওয়ে হয়েছে। তখন আমাদের শহর থেকে এই সিন্ডিকেটার অফিস রাস্তার দুধারে ছিল কত সুন্দর-সুন্দর পাম গাছ। এখন শুধু মেহগিনি আর আকাশিয়া টিকে আছে কয়েকটা। এস।

থাক্ গে। আমার ভয় করছে।

সে কী! যোগেশ্বর হা হা করে হেসে উঠলেন। ভূতের ভয়?

শর্মিষ্ঠা বলল, যাঃ! ভূত আমি মানিনে। সাপটাপ……

কথা কেড়ে যোগেশ্বর বললেন, ছাটস ট্রু। তবে আমি কি তৈরি হয়ে বেরুইনি ভাবছ? বলে প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট চর্চ বের করে

জ্বাললেন। নির্ভয়ে চলে এস। তোমাকে ঘাটটা দেখাতে চাইছি, তার কারণ তুমি পতটত লেখ। এক অপূর্ব—ওয়াগারফুল বিউটি স্পট শমু! মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তবে সবচেয়ে সুন্দর লাগে জ্যোৎস্না রাত্রে। কিন্তু আমার ওই প্রব্লেম, ভগুটা বড্ড বোকা। আজকাল যা চোরচোট্টার উপদ্রব বেড়েছে কহতব্য নয়। বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেশিক্ষণ কাটানো যায় না।

কথা বলতে বলতে ছুজনে এগিয়ে গিয়ে ভাঙা গেটের ওধারে সেকালের সিঁড়ির মাথায় পৌঁছলেন। তারপর যোগেশ্বর নিচে এদিকে ওদিকে আলো ফেলছিলেন। হঠাৎ শর্মিষ্ঠা চমকে উঠে অফুট স্বরে বলে উঠল, ও কী? ওটা কী?

দাছকে সে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল। এমন বেমক্সা জড়িয়ে ধরা যে যোগেশ্বর টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। নৈলে ভাঙা শাওলা ধরা পাথরের ধাপ গড়িয়ে সোজা নদীতে গিয়ে পড়তেন।

যোগেশ্বর নাতনির আচরণে ধাঁধায় পড়ে গিয়ে বেমক্সা গর্জন করে বললেন, কোন ব্যাটা রে? কে তুই? গুলি করে মারব ব্যাটাছেলেকে!

তাতেও রাগ পড়ল না। নদীর দিকে মুখ করে অলস্তু টর্চ পিস্তলের ভংগিতে বাগিয়ে আরও জোরে চেষ্টিয়ে বললেন, কথা বলছিস নে যে? তবে রে স্কাউণ্ডেল!

শর্মিষ্ঠা বলল, আঃ! এদিকে কোথায়? এদিকে-এদিকে।

সে বাঁপাশে নিচের ঝোপঝাড়ের দিকটা দেখাল। তখন যোগেশ্বর হস্তদন্ত হয়ে সেদিকটায় আলো ফেললেন। ছোট্ট টর্চের আলো বেশিদূর পৌঁছল না। কিন্তু ততক্ষণে যোগেশ্বর টের পেয়েছেন। বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন নাতনির কথায়।

একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, কৈ, কাকেও তো দেখছি না। তুমি কী দেখেছিলে বলো তো?

উদ্বিগ্ন শর্মিষ্ঠা বলল, কী যেন দেখলুম নড়াচড়া করছিল।

যোগেশ্বর এবার হা হা করে হেসে ফেললেন।...চোখের ভুল, শ্রেফ

চোখের ভুল ! তোমরা কলকাতার মানুষ কিনা। সব সময় আলোর মধ্যে কাটাও। তাই.....

শর্মিষ্ঠা বলল, ভ্যাট ! বড্ড জাডশেডিং !

যোগেশ্বর বললেন, তাহলেও এমন জঙ্গলে জায়গায় তো ঘোরো না। অন্ধকারে ভুল দেখেছ। হ্যালুমিনেশান !

শর্মিষ্ঠা পা বাড়িয়ে বলল, অন্ধকারে ঘুরতে ভাল লাগে না চলো, ফেরা যাক। অনেকদিন পরে যোগেশ্বর বাতনিকে নিয়ে বেড়ানোর সুবাদে খোলানোয় ঘোরার পুরানো আনন্দ অনুভব করছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাড়ির দিকে ফিরতে হল। একসময় গ্রামাঞ্চলের থানায় দাপটে দারোগাগিরি করেছেন। অন্ধকার রাতবিরেতে ঘোরার অভ্যাস ছিল। পরে প্রশ্রয় পেতে-পেতে যখন উঁচুপদে ওঠেন, তখনও সেই এ্যাডভেঞ্চারের নেশা কাটেনি মন থেকে। চূপচাপ বাড়ি বসে দিন কাটানো তাঁর মতো মানুষের পক্ষে কষ্টকর। অগত্যা বাগান করার নেশায় মেতে ওঠেন। কিন্তু এখনও গা ছমছম করা অন্ধকার রাতবিরেতে তাঁর অকারণে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। পারেন না। দিনে দিনে চোরচোড়ার উপদ্রব যা বাড়ছে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে রাস্তায় পৌঁছে বললেন, মন্দ এ্যাডভেঞ্চার হল না। কা বলো শ্যু? ফিরে গিয়ে গল্প করবে সবার কাছে, ম্যাকফার্সনের জাহাজ ঘাটায় ভূত দেখেছিলে !

শর্মিষ্ঠা জোরে মাথা নেড়ে বলল, ভ্যাট ! ভূত আমি মানিনে

কিন্তু একটা কিছু দেখেছিলে তো ?

কে জানে !...একটু চুপ করে থাকার পর শর্মিষ্ঠা ফের বলল, শোন দাছ। তুমি ভূত বিশ্বাস করো ?

যোগেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন, খুব করি।

কখনও দেখেছ ?

হুঁউ।

কোথায় দেখেছ বলো না।

যোগেশ্বর সাবধানে গাড়ি চালান। পুরনো মডেলের গাড়ি। কিন্তু

বিগড়ায় কদাচিৎ। এখানে হাইওয়ে ঘুরে রেললাইন পেরিয়ে গেছে।
শুঁরা ডাইনে ঘুরে শহরের দিকে এগোলেন।

শর্মিষ্ঠা ফের বলল, কই বলো, কোথায় দেখেছ ভূত ?

যোগেশ্বর বললেন, খাওয়ার টেবিলে বলব'খন।

শর্মিষ্ঠা জেদ ধরে বলল, না। এফুনি বলো।

যোগেশ্বর জানেন তাঁর এই নাতনিটি বড় এমরোখা মেয়ে। কিন্তু এটা একটা বেয়াড়া রাস্তা। শহরের এদিকটায় খেলার মাঠ, ইঁটভাঙা, কাঠগোলা রয়েছে। তাই রাস্তা যদিও নিরিবিলা, ওপাশে ধোপাবস্তি থেকে অনেক সময় দু-একটা গাধা এবং মুন্সোফরাসবস্তি থেকে আচমকা শুওরের পাল এসে পড়ে। তুধারে ঝোপবাড়ি বলে বোঝা যায় না, কখন ওরা ঝোপ ফুঁড়ে রাস্তা পেরুতে আবির্ভূত হবে। একবার একটা গাধা তাঁকে বড্ড বিপাকে ফেলেছিল। গাড়ি ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারে আর কী! আর একবার এক পাল শুওরের মধ্যে পড়ে খুব ভুগেছিলেন। একটা ধাড়ী শুওরের ঠ্যাং খোঁড়া করে দশটা টাকা গচ্চা গিয়েছিল। আজকাল লোকেদের হালচাল অল্পরকম। কথায়-কথায় দলবেঁধে মিছিল করে বেরিয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলো ওত পেতেই আছে এ মফস্বল শহরে। সুযোগ পেলেই এগিয়ে এসে মাথায় ছাতা ধরে। যোগেশ্বর রাজনীতিওয়ালাদের বেজায় ভয় পান।

কিন্তু নাতনির মন না রাখলেও বিপদ ঘটতে পারে। গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে বললেন, সেবার এই পৈতৃক শহরে বদলি হয়ে এসেছি। বছর দশেক আগের কথা। এখান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে একটা পুরানো বাগান বাড়ি আছে। ফরাসডাঙ্গা জায়গাটার নাম। কাছাকাছি বসতি বলতে কিছু নেই। গঙ্গার ধারে পাঁচ একর জায়গা জুড়ে বাগান আর মস্তো দোতলা বাড়ি। আমাদের পুলিশের ইনফর্মার থাকে জানো তো ? তার কাছেই খবর পাওয়া গেল, সেদিন রাতে ওই পোড়ো বাগান বাড়িতে একদল ডাকাত জুড়ে হবে। তারা নাকি হরিণমারা নামে একটা গাঁয়ে ডাকাতি করতে যাবে। যার বাড়ি ডাকাতি করবে, সে একজন বড়লোক জোতদার। তো খবর পেয়েই একদল কনস্টেবল

আর অফিসার পাঠিয়ে দিলুম হরিণমারায়। আর আমি চললুম জনা দশেকের পাঠি নিয়ে। যুটযুটে অন্ধকার রাত। বাগান বাড়িটা ঘিরে ফেললুম। বন্দুক পিস্তল টর্চ লাঠি-সোটা—আমরা একেবারে তৈরী হয়েই গেছি।

চুপ করতে দেখে শর্মিষ্ঠা বলল, তারপর ?

ত্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে উত্তেজিত ভাবে যোগেশ্বর বললেন, দেখ, দেখ ! কী আপদ !

শর্মিষ্ঠা বলল, কী দাছ ? সে ভয় পেয়ে দাহ্র কাছ ঘেঁষে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে।

যোগেশ্বরের মুখে শক্ত ভাব। ফর্সা কামানো গাল ঠেলে সার সার চোয়ালের দাঁতের আভাস। দাঁত কড়মড় করছেন বোঝা যায়। মস্তো গৌফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপছে।

একদল শুওর ঝোপ ফুড়ে বেরিয়ে ঘোঁত ঘোঁত ঘোঁত করে রাস্তা পেরুচ্ছিল। জল কাদায় নোংরা তাদের শরীর। একটা খাড়ী শুওর হঠাৎ থেমে গাড়ির সামনেটা শূঁকে গেল।

যোগেশ্বর মুখ বাড়িয়ে বললেন, দেখছ, দেখছ ব্যাটারদের স্পর্ধা ?

শুওরের দলটা চলে গেলে গাড়ি স্টার্ট দিলেন। শর্মিষ্ঠা বলল, হুঁ, ভূতের গল্লটা।

মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেছে। সামলে নিয়ে যোগেশ্বর বললেন, ফরাসডাঙ্গার বাগান বাড়িটা একশো বছর আগে বানিয়েছিলেন পূর্ণিয়ার এক জমিদার। ওই সময় জমিদারী আর নেই। সে জমিদারও কবে মারা গেছেন। বংশধরদের মধ্যে মামলা বেধেছে তাই বাড়িটার অমন দুর্দশা।

বিরক্ত শর্মিষ্ঠা বলল, আহা, ভূত দেখার কথাটা বলো।

বলি। যোগেশ্বর এক হাতে স্ট্রিয়ারিং ধরে অগ্র হাতে গৌফ পাকিয়ে নিলেন ! ঠোঁটে মুচকি হাসি।...তো বাগানবাড়ি একেবারে নিশুতি। ভাবলুম, ইনফর্মার ভুল খবর দিলে ? নাকি ব্যাটারা একটা কিছু আঁচ করে কেটে পড়েছে ? টর্চ জ্বলে বুঝে নিলুম অবস্থাটা।

গুলি বা বোমা ছুঁড়বে বলে ভয় ছিল। কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না। তখন একজন সাব-ইন্সপেক্টর আর দুজন সেপাই নিয়ে ভাঙা জানলা গলিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বড় বড় সব ঘর। দরজা জানলা ভাঙা। এঘর ওঘর ঘুরে হলঘরে গেলুম। সেখানে দোতালায় ওঠার চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়িটা কাঠের। ছেঁড়াখোঁড়া কার্পেট পাতা রয়েছে কোথাও কোথাও। দিনের বেলা যে লোকটা দেখাশোনা করে, সে ব্যাটা ততদিনে বাড়ির জিনিসপত্র একে একে সরিয়ে ফেলেছে!

শর্মিষ্ঠা বলল, ভ্যাট! ভূত কোথায়?

আছে। যোগেশ্বর রহস্যময় হাসলেন। হলঘরে যেই গেছি, কাঠের সেই সিঁড়ির মাথায় অমনি মচমচ শব্দ শুনতে পেয়েছি। কৈ হায় বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সিঁড়িতে উঠলুম আমরা। তারপরে যা দেখলুম,...

বাপ্‌স! গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

কী, কী দেখলে?

সাদা কাপড় পরা একটা মূর্তি।

তারপর, তারপর?

মূর্তিটা যেন শূণ্যে ভাসছে।

সত্যি?

যোগেশ্বর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বললেন, মিথ্যা নাকি? সাদা কাপড় পরা মূর্তিটা আস্ত একটা কঙ্কাল।

ভ্যাট! বিশ্বাস করিনে।

শমু একদিনু বানিয়ে বলছিলেন। সাদা কাপড় পরা কংকালটার দিকে যেই রিভলবার তাক করেছি, শো করে শূণ্যে উঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। ট্রিগারে চাপ পড়েছিল। গুলিও বেরুল। প্রচণ্ড শব্দ হল পোড়ো বাড়িতে। পায়রাগুলো ভয় পেয়ে হলুহুলু বাধাল। আর সেই সময় একটা বিকট হাসি শুনলাম। মেয়েলি হাসি। কতকটা এরকম—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ...।

রাশভারি যোগেশ্বরকে ভূতুরে হাসি হাসতে দেখে শর্মিষ্ঠা খিলখিল করে হেসে লুটোপুটি খেল।

যোগেশ্বর রাগ করে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

এক বর্ণও না।

হুঁউ, খুব সাহস তোমার ! রোসো, কাল বাগানবাড়িটা দেখিয়ে আনব।

শর্মিষ্ঠা বলল, আচ্ছা দাছ, ও বাড়িতে আমরা যদি পিকনিক করতে যাই, কেউ বারণ করবে ?

মোটোও না। অনেকেই তো যায়। তবে রাত্রিবেলা কেউ থাকতে চায় না। সন্ধ্যার আগেই চলে আসে।

শর্মিষ্ঠা ভাবতে ভাবতে আনমনে বলল, আমরা রাত্রিবেলাই যাব। থাকব। পিকনিক করব।

যোগেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, ঐ্যা ! বলো কী ?

ভূত দেখা চাই-ই। শর্মিষ্ঠা শক্ত মুখে বলল।

সর্বনাশ ! কিন্তু আমি বাপু এসবে নেই। বাড়ি ছেড়ে নড়তে পারব না বলে দিচ্ছি। আজকাল যা চোরের বাড়ি হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা হাসল।...তোমায় দলে নেব না। কাল মিলুদা এসে যাচ্ছে আর এখান থেকে জলিকে নেব।

যোগেশ্বর উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, জলি ? ভোম্বল উকিলের মেয়ে ? বেশ, ভাল। কিন্তু তোমার মিলুদাটা কে ?

মিলনকে চেন না ?

ও. সেই ছোকরা। যোগেশ্বর ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। সে আসছে বুঝি ?

হুঁউ।

আমার এখানেই উঠবে নাকি ?

শর্মিষ্ঠা ভুরু কঁচকে বলল, আপত্তি আছে তোমার ? বেশ। সে ট্রান্সিস্ট লঞ্জে উঠবে।

যোগেশ্বর কাঁচুমাঁচু হয়ে বললেন, আহা না, না। তবে ছোকরা বড্ড গণ্ডগোল পাকায়। সেবার আমার গাড়িটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল।

শর্মিষ্ঠা গুনগুন করে গান গাইতে থাকল। দাছুর কথায় কান দিল না। যোগেশ্বরের গাড়ি বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে।

গেটের কাছে গিয়ে ব্রেক কষে অভ্যাস মতো যোগেশ্বর হাঁক দিলেন, ভণ্ড! ভগো! ওহে ভার্গবচন্দ্র! গেটটা খোল।

গাড়ি বারান্দা থেকে আচমকা ছিটকে বেরিয়ে এল ভণ্ড ঠাকুর। তারপর বলা নেই কওয়া নেই গেটের ওধারে দাঁড়িয়ে ভেউভেউ করে বিকট কেঁদে উঠল।

গাড়ি থেকে একলাফে নেমে যোগেশ্বর ভাঙা গলায় বললেন, কী, কী, কী হয়েছে ভণ্ড?

ভণ্ড বুক চাপড়ে এবং চুল খামচাতে খামচাতে কী সব বলতে থাকল, মাথামুণ্ড একটুও বোঝা যাচ্ছিল না। তখন যোগেশ্বর একটা কিছু অনুমান করে দৌড়ে লন পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দরজা খোলাই ছিল। সব ঘরে আলো জ্বলছিল।

ভেতরে গিয়েই টের পেলেন কী ঘটেছে।

শর্মিষ্ঠা পেছন-পেছন দৌড়ে এসেছিল। দেখল, যোগেশ্বর পাগলের মতো এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছেন।

তারপর যোগেশ্বর শোবার ঘর থেকে বন্দুক বের করে বারান্দায় গেলেন এবং বেমকা ছবার গুডুম গুডুম করে গুলি ছুঁড়লেন।

তারপর ভাঙা গলায় বিকট চৈচিয়ে উঠলেন, চোর! চোর! পাকড়ো, পাকড়ো!

শর্মিষ্ঠা ওঁকে পেছন থেকে ধরে ফেলল। বলল, আঃ হচ্ছে কী? কোথায় চোর? বস তো সুস্থ হয়ে বস।

যোগেশ্বর ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন।...নিল যা নিল, কিন্তু আমার ট্রফিগুলো...ওঃ হো হো হো!

শর্মিষ্ঠা ফোনের দিকে এগিয়ে বলল, থানার নম্বর কত?

চোখের জল মুছতে মুছতে যোগেশ্বর বললেন, চাইলেই দেবে।

শর্মিষ্ঠা ফোন তুলল। যোগেশ্বর তখনও গলার ভেতর ও হো হো

করে আতর্জনাদ করছেন। সে মুহূর্তে ভগ্নুর কথা মনে আসছে না।
এলে হয়তো তাকে গুলি করেই বসতেন।

গাড়িটা গেটের বাইরে দাঁড় করানো রইল।* ভগ্নু সেখানে দাঁড়িয়ে
আকাশ-পাতাল ভাবছিল।...

॥ দুই ॥

পুলিস বিভাগের নামকরা ছুঁদে অফিসার ছিলেন যোগেশ্বর। রিটায়ার
করলেও তাঁর প্রভাবের ঘাটতি পড়েনি। নানা ব্যাপারে এ শহরের
পুলিস অফিসাররা তাঁর পরামর্শ নিতে দৌড়ে আসেন।

সুতরাং সে-রাতেই যথেষ্ট ভুলুসুলু পড়ে গিয়েছিল। বাঘের ঘরে
ঘোগ—সর্বের মধ্যে ভূত ঢুকে বেমানুম কাজ সে-রে গেল, এ ভারি
আশ্চর্য ঘটনা বটে। বাঘা ডিটেকটিভ অফিসার গঙ্গাধর হাটি কান
চুলকে বলেছেন, এটাই সমস্যা। কোনো ক্লু রেখে যায়নি ব্যাটার।
তবে আমার ধারণা, আপনার ভগ্নুচন্দ্র মুখ খুললে একটা কিনারা হয়।

যোগেশ্বর খাপ্লা হয়ে বললেন, আপনার মাথা হয়! ভগ্নুকে আমি
জানিনা, আপনি জানেন? ভগ্নু আমার সঙ্গে তিরিশ বছর আছে।
চুরিচামারি দূরে থাক, একটা আলপিন হারায়নি আমার বাড়ি থেকে।

কিন্তু ভগ্নুচন্দ্র ছিল কোথায় তখন? গোয়েন্দা ভদ্রলোক বলেছেন।
ও বলেছে, বাগানে গরু ঢুকেছিল। গরুটা তাড়িয়ে রাস্তার ওপারে
জুঙ্গলে ঢুকিয়ে দিতে গিয়েছিল। তারপর পায়ে কাঁটা ফোটে। সেই
কাঁটা বের করতে যতক্ষণ সময় লেগেছে, ততক্ষণে চোর জানলার রড
কেটে ঘরে ঢুকেছে। যাই বলুন, স্টেটমেন্টটা কেমন যেন।

যোগেশ্বর রাগ দেখিয়ে বলেছেন, যান মশাই! খালি ভগ্নুচন্দ্র আর
ভগ্নুচন্দ্র। এ আপনার কস্ম না। পুলিসসুপার প্রমথকে খবর দিয়েছি।
খুব বুদ্ধিমান ছোকরা।

পুলিসসুপার দলবল নিয়ে এসে যোগেশ্বরের বাড়ি চষে ফেললেন।

তারপর আশ্বাস দিয়েছেন, কিছু ভাববেন না মিঃ চ্যাটার্জী। কয়েকটা দিন সময় দিন। অন্তত আপনার অমূল্য ট্রফিগুলো আর তাম্রফলক উদ্ধার করে দেবই। বাকি জিনিষ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না আপাতত। তবে চেষ্টা করব। রীতটা এই করে কেটেছে। ভাল ঘুম হয়নি যোগেশ্বরের। বাইরে বারান্দায় দুজন সেপাই সারারাত টহল দিয়েছে। ভোরে যোগেশ্বর তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়েছেন। চোর কি আবার আসবে নাকি? খামোকা বেচারাদের কষ্ট করা।

শর্মিষ্ঠার ঘুমের অসুবিধে হয় নি। কিন্তু মনে ভয়টা ছিল। চোর যদি আবার এ ঘরেই হানা দেয়? অবশ্য সেপাই পাহারা আছে। সেই যা স্বস্তি। তবু ভোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। ভূত চোর দুইয়ে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন!

সকালে ব্রেকফাস্টের পর শর্মিষ্ঠা বলল, শোনো আমি জলিদের বাড়ি যাচ্ছি। মিলুদা দশটা নাগাদ এসে পৌঁছবে। তুমি যেন ওর অসম্মান করো না।

শোকে মুহূর্তমান যোগেশ্বর আনমনে বললেন, করব না! ছেড়ে দেব?

শর্মিষ্ঠা ভুরু কুঁচকে বলল, মিলুদাকে তুমি অসম্মান করবে?

বুঝতে পেরে যোগেশ্বর বললেন, না, না! ওর কথা বলিনি। তুমি যেখানে যাচ্ছ, যাও তো! আমায় বকিও না।

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বেরুল।

এই এলাকাটা পুরানো শহরের লেজের মতো গজিয়েছে গত বিশ বছরে। প্রচুর খোলামেলায় একটা করে সুন্দর বাড়ি। গাছপালা ঘোপঝাড়ও যথেষ্ট। তিনটে বাড়ির পর ভোম্বল বাবুর বাড়ি। জজকোর্টে ওকালতি করে পয়সা করেছিলেন ভোম্বলবাবু। শহরের ভেতর পৈতৃক বাড়ি বেচে এখানে বাড়ি করেছিলেন। ভোম্বলবাবুর সঙ্গে যোগেশ্বরের বনে না। কেন বনে না, তা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে একটা বড় কারণ হল, যোগেশ্বরের একটা ডাকাতি কেসের আসামীকে ভোম্বল জজকোর্টে খালাস করতে পেরেছিলেন।

ভোম্বলবাবুর মেয়ে জলির সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বড় ভাব। শর্মিষ্ঠা দাহুর বাড়ি ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত আসে। তবে ভাবটা হয়েছে বড়বেলায়। গত বছর নদীর ধারে জোর পিকনিকও করেছিল শর্মিষ্ঠা। কলকাতার মেয়ে বলে মফস্বলী মেয়েরা ওকে নায়িকা করে তুলেছিল।

বাড়ির কাছাকাছি দেখা হয়ে গেল জলির সঙ্গে। জলি বলল, তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম। শুনলুম, জেঠুর বাড়ি নাকি চুরি হয়েছে? সত্যি?

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বলল, বিশাল চুরি। চোর খালি বেছেবেছে দাহুর ট্রিকগুলো নিয়েছে। খান কতক রূপোর রেকাবিও নিয়েছে অবশ্য। সেটা ভুল করে।

ভুল করে মানে? জলি অবাক হয়ে বলল।

তাই মনে হচ্ছে। শর্মিষ্ঠা ওর হাত নিয়ে আদর করার ভঙ্গিতে বলল। এসব আজো কথো থাক। শোনো, যে জন্তো আসছি। ভেরি কনফিডেনশিয়াল।

হুজুনে রাস্তার ধারে কুঞ্চুড়া গাছের তলায় গেল। জলি কৌতূহলী হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

শর্মিষ্ঠা বলল, এবেলা মিলনদা—মানে সেই ভদ্রলোক এসে যাচ্ছে...

দ্রুত কথা কেড়ে নিয়ে জলি বলল, শমু! তোমরা কি বিয়ে করে ফেলেছ?

শর্মিষ্ঠা চোখ পাকিয়ে বলল, শাট আপ! বিয়ের কথা হুতোমার মাথায় এসে গেল? অদ্ভুত তো!

অপ্রতিভ জলি বলল, না—মানে, কনফিডেনশিয়াল বললো কি না?

হঁ, ভেরি কনফিডেনশিয়াল। শর্মিষ্ঠা চাপা গলায় দুট্ট হেসে বলল। তার আগে জানতে চাই, তুমি ভূত বিশ্বাস করো কি না?

জলি আকাশ থেকে পড়ার মতো বলল, ভূত! কোথায় ভূত?

তোমার মাথায়। কথাটার জবাব দাও আগে।

ভূত বিশ্বাস করি কিনা বলছ?

হঁ।

জলি জোরে মাথা নেড়ে বলল, না না এবং না।

কর না তো ?

একটুও না।

ধরো, কোনো পোড়ো বাড়িতে আমরা যদি পিকনিক করতে যাই—উছ, দিনে নয়, রাত্রিবেলা—তুমি রাজি ?

জলি খুশিতে নেচে উঠল। খুব রাজি। ভীষণ রাজি। কিন্তু কে কে যাবে, তাই বলো।

মিলুদা দলে থাকলে আপত্তি আছে তোমার ? থাকা উচিত নয়।

এবার জলি একটু কাঁচুমাচু ভাব দেখিয়ে বলল, না, না। বাড়িতে ম্যানেজ করতে হবে। সেটাই প্রব্লেম। মানে, বাইরে রাত কাটানোটা গার্জেনরা পছন্দ করবেন না।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি যদি তোমার গার্জেনদের বলি, জলিকে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছি একদিনের জন্য, ওঁরা আপত্তি করবেন ?

জলি ভাবতে ভাবতে বলল, ভীষণ আপত্তি করবেন। কিন্তু জায়গাটা কোথায় আগে শুনি ?

তোমাদের দেশেই। শর্মিষ্ঠা রহস্যময় হাসল।

কোথায় শুনি ?

ফরাসডাঙ্গার বাগানবাড়িতে।

জলি চোখ কপালে তুলে বলল, নন্দন কাননে ? ওরে বাবা !

নন্দন কানন মানে ?

জলি উদ্বিগ্নমুখে বলল, যে বাড়ির কথা বলছি, তার নাম। বাড়িটার অনেক বদনাম শুনেছি। ভূতটুত আমি মানিনে। কিন্তু ওটা নাকি চোর-ডাকাতের আড্ডা। এলাকার চোরডাকাতরা ওখানে মিটিং-ফিটিং করে।

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে বলল, হঁ। দাছ তাই বলছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভূতের কথাও বলছিলেন। আমার ভীষণ ইচ্ছে, সত্যি সত্যি ভূত আছে কিনা দেখব। কী ? ভয় করছে বুঝি ?

জলি একটু হাসল।—যাঃ! ভূতটুত বাজে কথা। কিন্তু অতদূর যাবে কীভাবে? বাস রাস্তা থেকে এক মাইল হাঁটতে হবে যে। অনেকদিন আগে একবার আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। বাড়ির ভেতর ঢুকিনি। বাগানে পিকনিক করেছিলুম। বাড়িটার চেহারা দেখে কেমন মিস্ট্রিয়াস লাগে।

শর্মিষ্ঠা ব্যস্তভাবে বলল, আমরা বিকেলের বাসে যাব। আমি, মিলুদা আর তুমি। সঙ্গে পিকনিকের জিনিসপত্তর তো থাকবেই। কী কী নেব, লিস্ট করে ফেলি, চলো।

জলি বলল, আরও দু'একজনকে সঙ্গে নিলে ভাল হত, শমু!

শর্মিষ্ঠা আপত্তি করল। নো, নো, নো, নো। দল বাড়ালেই ঝামেলা হবে। এ তো নিছক পিকনিক নয়, এ্যাডভেঞ্চার। বেশি লোক থাকলেই চ্যাঁচামেচি হইহল্লা হবে।

জলি উত্তেজনা চেপে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু বাড়িতে ম্যানেজ করাটাই যে সমস্যা।

শর্মিষ্ঠা পা বাড়িয়ে বলল, চলো না দেখি—ম্যানেজ করা যায় কি না।

জলি বাধা দিল, না না। আমার গার্জেনদের তুমি চেনো না। দিনের বেলা কোথাও গেলে আপত্তি হয় না। কিন্তু বাইরে রাত কাটানো ইমপসিবল।

হতাশ ভংগিতে শর্মিষ্ঠা বলল, তাহলে?

জলি ফিসফিস করে বলল, শোন। আমি অন্তত এক রাতের জন্ম রিভোল্ট করি। তোমার খাতিরে।

শর্মিষ্ঠা খুশি হয়ে বলল, এই তো চাই!

জলি বলল, তাহলে তুমি এখন কেটে পড়, শমু। বাবার কোর্টে বেক্রনোর সময় হয়ে এল। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে খেলার মাঠের পাশে হাইওয়ের বাস স্টপে। বিকেল পাঁচটায় বাসটা ছাড়ে। ওখানে পৌঁছয় পাঁচটা দশ-টশে। একটা বটগাছ আছে, সেখানে থাকব। তোমাদের দেখলে তবে চাপব। নৈলে ফিরে আসব। শিগগির বলো, কী কী নেব সঙ্গে?

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমায় কিছু নিতে হবে না। যা নেবার আমরা সব নেব ?

বাঁচলুম। জলি হাসল। সঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো প্রব্রম হত।

বাড়ি ঢুকে শর্মিষ্ঠা দেখল, যোগেশ্বর ড্রয়িং রুমে পায়চারি করছেন। চোখ দুটি প্রায় বন্ধ। শর্মিষ্ঠার পায়ের শব্দে আঁতকে উঠে চোখ খুললেন। তারপর ধমক দিয়ে বললেন, অমন চুপিচুপি কেন—চোরের মতো ? এঁ্যা ? আজ থেকে নিয়ম করে দিচ্ছি। এ বাড়িতে যে ঢুকবে কিংবা চলাফেরা করবে সাড়াশব্দ যেন দেয় ! নৈলে...দেখছ, এটা কী ?

বলে ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে রিভলবার বের করে দেখালেন।

শর্মিষ্ঠা খিলখিল করে হেসে উঠল।

যোগেশ্বর বললেন, ডোন্ট ল্যাফ। দিস ইজ সিরিয়াস।

শর্মিষ্ঠা বলল, ওতে গুলি পোরা আছে তো ?

আলবাৎ আছে। ছটা গুলি পুরে রেখেছি। চোর ব্যাটাচ্ছেলেদের সামনে দাঁড় করিয়ে গুনে গুনে ছুঁড়ব। যোগেশ্বর পায়চারি শুরু করলেন এবং রিভলবারটা পকেটে ঢোকালেন।

শর্মিষ্ঠা একটু চুপ করে থেকে ডাকল, দাছ !

হঁ, বলো।

মিলুদার আসার সময় হয়ে এল।

তা আমার কী ?

ও বেচারী তো জানে না কিছু। সাড়া শব্দ দিয়ে ঢুকবে না।

গুলি খাবে।

শর্মিষ্ঠা রাগ দেখিয়ে বলল, আর ইউ সিরিয়াস ?

আলবাৎ।

ঠিক আছে। বাস স্ট্যাণ্ডে যাচ্ছি। মিলুদা বাসে আসবে। ওকে নিয়ে সোজা ট্রান্সিস্ট লঞ্জে উঠব। আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই গে।

শর্মিষ্ঠাকে পা বাড়াতে দেখে যোগেশ্বর ব্যস্ত হলেন। আহা, ট্রান্সিস্ট লঞ্জে কেন ? এতবড় বাড়ি খালি পড়ে আছে কী জন্যে ! আমার

হবু নাভজামাই-ই বা কী ভাবে? আমার একটা প্রেসটিজ নেই নাকি ?

তাহলে আগে রিভলবারটা হামায় দাও। শর্মিষ্ঠা হাত বাড়াল। তোমায় কিছু বিশ্বাস নেই। তুমি ভীষণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছ।

অপ্রকৃতিস্থ কথাটার মানে জানো? উদ্ভাদ। মানে যার মাথা খারাপ। যোগেশ্বর থিয়েটারি ভংগিতে জলদগন্তীর গলায় বললেন। ইয়েস, মাথা খারাপ। আমার মাথার ঠিক নেই। আমার সারাজীবনের সব কৃতিত্বের পরিচয় লোপাট করে দিয়েছে ব্যাটা! ছেলে চোরেরা। ওঃ! ওহো হো! আর আমি বাঁচব না।

হুহাতে চুল আঁকড়ে ধরলেন যোগেশ্বর। ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। শর্মিষ্ঠা দাহুর পাশে গিয়ে আদর করতে করতে বলল, সোনার দাহু! লক্ষ্মী ছেলে! অমন কোরো না। ভেবে না, মিলুদা আশুক। তোমার সব জিনিস উদ্ধার করে ফেলব আমরা।

যোগেশ্বর বললেন, উদ্ধার করবি? তোরা? ফুঃ! হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল! বাজে বকিসনে।

এই সময় ধপাধপ শব্দ তুলে মার্চের ভংগিতে ভগু ঠাকুর ঘরে ঢুকল। হাতে শরবতের গ্লাস। বিনীতভাবে বলল, স্যার!

যোগেশ্বর কড়া করে বললেন—বিষ এনেছ তো? দাও। বিষ খেয়ে মরি।

শর্মিষ্ঠা বুঝেছে, ভগু ঠাকুরকে সাড়াশব্দ দিয়ে ঘরে ঢোকার নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। ভগু সামনের নিচু টেবিলে ট্রে রেখে গোমড়া মুখে চলে গেল। শর্মিষ্ঠা শরবতের গেলাসটা দাহুর মুখের সামনে ধরে বলল, এস। খাইয়ে দিই।

যোগেশ্বর বাচ্চা ছেলের মতো এক ঢোক খেয়ে কাতর স্বরে বললেন, এমন যদি হত, অনশন ধর্মঘট করলে হারামজাদারা আমারাজিনিসগুলো ফেরত দিত তাহলে তাই করতুম। বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে পোস্টার টাঙ্গিয়ে বসে পড়তুম। কিন্তু ওরা তো মিনিস্টার নয়, চোর। অনশনে মারা পড়লেও ওরা আসবে না। ওদের হৃদয় নেই—হার্টলেস ক্রিয়েচার্স।

শর্মিষ্ঠা বলল, নাও। হাঁ করো। ঢেলে দিই।

যোগেশ্বর চূপচাপ ঢোকে ঢোকে গিলে ফেললেন শরবতটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে গৌফ মুছলেন। তারপর বললেন, বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কেন বলো তো? তাই ভণ্ডকে বলেছিলুম শরবত তৈরি করো। খেয়েও কিন্তু গলার ভেতরে শুকনো ভাবটা যাচ্ছে না। ডাক্তারকে খবর দেব নাকি?

বলে হাত বাড়িয়ে ফোন তুললেন। শর্মিষ্ঠা উঠল। বাইরের বারান্দায় চলে গেল। বারান্দায় একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে সে লেনে নামল। অস্থির ভাবে মিলনের প্রতীক্ষা করতে থাকল। শর্মিষ্ঠাও দাহুর মতো খেয়ালী। মাথায় যেটা ঢুকেছে, সহজে বের হয় না। কতক্ষণে ফরাসডাক্তার পোড়ো বাগান বাড়িতে যাবে, কখন কলকাতা থেকে মিলন আসবে, সেই ভাবনায় আর সময় কাটতে চায় না।

মিলন গাঙ্গুলী উদীয়মান স্পোর্টসম্যান। ফুটবলে ইতিমধ্যে খুব নাম কিনিছে। কলকাতার একটা মাঝারি খ্যাতিসম্পন্ন ক্লাবের খেলোয়াড় সে। সেই সূত্রে শর্মিষ্ঠার বাবার সঙ্গে প্রথমে আলাপ পরিচয়। তারপর ওদের কোয়ার্টারে যাতায়াত থেকে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক এবং শেষে ছপক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে মিলনের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিয়ে আসন্ন হয়ে উঠেছে। আর বড় জোর মাস দুই বাকি আছে শুভকর্মের। কিন্তু শর্মিষ্ঠা অত্নদের সামনে তার হবু বর সম্পর্কে দাদাটাদা করে বলে। একলা হলে সোজা নাম ধরে ডাকাডাকি, নৈলে মিলুদা। কখনও মিলনদা। মিলনের চেহারায় স্বভাবত খেলোয়াড়োচিত ঝজু ভাবভঙ্গি আছে। শক্তসমর্থ পেটাই গড়ন। মোটামুটি ফর্সা শর্মিষ্ঠার তুলনায়। শর্মিষ্ঠাকে সুন্দরী নিশ্চয় বলা যায়, কিন্তু গায়ের রঙটা তত ফর্সা নয়। তার গড়নে কোমলতা তত নেই, ঈষৎ পুরুষালি ভাব আছে। মুখচোখে তীক্ষ্ণতা আছে। স্পোর্টসেও প্রবণতা আছে। যদিও ততকিছু নেশা নেই বলে বেশিদূর এগোয় নি। মিলনের ইচ্ছা, ও স্পোর্টসে তার মতই মেতে উঠুক। সুইমিংয়ে দক্ষতা আছে শর্মিষ্ঠার। রাইফেল শুটিংয়েরও হাত মন্দ না। কিন্তু মুশকিল করেছে তার

কবিত্বশক্তি। রাশি রাশি পণ্ড লেখে খাতায়। ভীষণ ভাবপ্রবণ হয়ে
ওঠে মাঝে মাঝে। সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামায়। মিলনের
অপছন্দ শুধু এটুকুই।

দশটা বেজে গেল মিলনের পৌছতে। রাস্তায় তাকে দেখামাত্র
শর্মিষ্ঠা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তার আসার কথা ছিল শর্মিষ্ঠার সঙ্গেই।
কিন্তু পর-পর দুদিন খেলা ছিল বলে আসতে পারে নি।

কাঁধে নীল ব্যাগ ঝুলিয়ে ধীরেস্থস্থ আসছিল মিলন। এ বাড়িতে
সে এর আগে বার তিনেক এসেছে শর্মিষ্ঠা-দর সঙ্গে। বাড়িটা সে
চেনে। গেটে শর্মিষ্ঠাকে দেখে একটু হেসে বলল, বাসস্ট্যাণ্ডে তোমাকে
খুঁজছিলুম।

শর্মিষ্ঠা বলল, তেমন কোন কথা ছিল না।

কিন্তু আশা ছিল।

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে বলল, মাঝে মাঝে হতাশ হওয়া ভাল। যাক
গে, শোন, দাছুর বাড়িতে কাল বিকেলে চুরি হয়েছে। দাছুর সব ট্রফি
আর দামী কী সব জিনিষ চুরি করেছে চোরে। দাছুর ব্যাপার তো
জানো। সামলাচ্ছি ঠুঁকে। দাঁড়িয়ে কেন? এস।

লনে হাঁটতে হাঁটতে মিলন বলল, পুলিশ ক্যামিজিতে চুরি। চোরের
সাহস তো কম নয়।

শর্মিষ্ঠা হাসল। হ্যাঁ। শহরের পুলিশফোর্স জান লড়িয়ে দিয়েছে।
এক মিনিট—

কী? মিলন দাঁড়াল গাড়িবারান্দায়। যোগেশ্বরের গাড়িটা ওখানেই
থাকে। গাড়িতে হেলান দিল সে।

শর্মিষ্ঠা চাপা গলায় বলল, আজকের প্রোগ্রামটা আগে জানিয়ে
দিই! তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

ব্যাপারটা কী? হঠাৎ ভূতটুত আসছে কোথেকে?

যদি বলি, একটা ভয়ংকর পোড়োবাড়িতে আমরা রাত কাটাতে
যাব, তুমি রাজি?

মিলন গাল চুলকে বলল, কিছু বুঝলুম না। চুরি হয়েছে বলছ,
আবার বলছ ভয়ংকর পোড়োবাড়িতে রাত কাটাতে যাবে। এসবের
মানে কী?

শর্মিষ্ঠা বলল, এ্যাডভেঞ্চার।

চুরির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কি কিছু ?
নেই।

ভেতর থেকে যোগেশ্বরের গর্জন শোনা গেল, কে ? কে ওখানে ?
হু ইজ দেয়ার ?

শর্মিষ্ঠা বলল, আমরা।

আমরা কারা ?

চোরেরা।

ওমনি দরজার পর্দা কাঁক করে যোগেশ্বরের মাথা বেরিয়ে এল।
তারপর অনিচ্ছাসঙ্গে হাসলেন। হেসেই গম্ভীর হলেন। বললেন,
রসিকতার মনমেজাজ এখন নেই। ওটা কে ?

আমি মিলন, ঠাকুরদা। বলে মিলন এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল।

তা ওখানে দাঁড়িয়ে কী ফিসফিস কথাবার্তা হচ্ছে ? যোগেশ্বর
সন্দেহসংকুল ভঙ্গিতে বললেন। দেখ বাবু, বাড়িতে সত্ত্ব চুরিচামারি
হয়েছে। এই সিঁচুয়েশানে অমন গুজগুজ ফিসফিস কাণ্ডকারখানা ভাল
নয়। এস, ভেতরে এস।

ভেতরে ঢুকলে যোগেশ্বর বললেন, যাও। কাপড়চোপড় বদলে
বিশ্রাম-টিশ্রাম করে নাও। তারপর কথাবার্তা হবে। শমু, ঠাকুরকে
বলে দে, গেস্ট এসেছে।

মিলন বলল, কী চুরি হয়েছে ? কী ভাবে হল বলুন তো ?

সব পরে শুনবে। এখন আমি কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না।
যোগেশ্বর গোমড়া মুখে পায়চারি শুরু করলেন।

মিলন শর্মিষ্ঠাকে অনুসরণ করল। বাগানের দিকের একটা ঘরে
গিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, তুমি তো চা খাও না। সফট ড্রিংক আনছি।

না। ঘেমে তেতে এসে ঠাণ্ডা খাব না। মিলন খাটে পা ঝুলিয়ে
বসল।

শর্মিষ্ঠা একটা চেয়ারে বসে বলল, স্নান করে নাও তাহলে। তারপর
সেই প্রোগ্রামের কথাটা বলব।

‘ মিলন বলল, প্রোগ্রাম মানে ভূতটুতের ব্যাপারটা তো ?

হ্যাঁ।

বলো, শুভস্ম শীঘ্রম।

এখনই বলব ?

তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি ভীষণ চঞ্চল। অতএব এখনই বলো।

শর্মিষ্ঠা হাসল।...ভূতের ভয়ে আমাদের ফেলে পাগিয়ে আসবে না তো ?

আহা, আগে বলো না ব্যাপারটা ?

শর্মিষ্ঠা সিরিয়াস হয়ে চাপা গলায় বলল, এখান থেকে আট মাইল দূরে একটা পোড়ো বাগানবাড়ি আছে। নন্দন কানন নামে। সেখানে নাকি অসংখ্য ভূত আছে। আমি, তুমি আর জলি—মানে সেই মেয়েটি... বুঝেছি। বলো।

আমরা তিনজনে বিকালের বাসে সেখানে যাব। বাসস্টপ থেকে নাকি এক মাইল হাঁটতে হবে। জলি রাস্তা চেনে।

তারপর ?

সারারাত নন্দন কাননে কাটাও। আবার কী ?

যদি সত্যি ভূত থাকে ?

তাহলে তো ভারি আনন্দের ব্যাপার হবে।

কিন্তু তোমার দাছ আপত্তি করবেন না ?

করবে না। করলেও গুনব না।

বেশ।

তাহলে সঙ্গে কী কী নেব একটা লিস্ট করে ফেলা যাক।...বলে শর্মিষ্ঠা ড্রয়ার থেকে কাগজ কলম বের করল।

শর্মিষ্ঠা আর মিলনের ব্যাপার স্থাপার দেখে যোগেশ্বরের খটকা লেগে-ছিল। বিকাল নাগাদ বুঝলেন, ওরা কোথাও যাবার মতলব করেছেন।

পর্দার কাঁকে একটা চোখ রেখে চুপিচুপি দেখলেন, ছোটো ব্যাগি বোঝাই হয়ে আছে। তখন সটান ঘরে ঢুকে বললেন, এ কিসের ষড়যন্ত্র ?

শর্মিষ্ঠা হাসল।—ভূত বধের।

ভূত ? যোগেশ্বর অবাক হয়ে গেলেন।

শর্মিষ্ঠা বলল, হ্যাঁ, তোমাদের সেই নন্দন কাননের কঙ্কালবধের পালা হবে।

যোগেশ্বর আঁতকে উঠলেন। সর্বনাশ। তোমরা কি সত্যি ওখানে রাত কাটাতে যাচ্ছ ? দেখ, মারা পড়বে। একেবারে প্রাণটি যাবে।

শর্মিষ্ঠা ঘড়ি দেখে বলল, এই রে ! পাঁচটা হয়ে এল যে। চলো মিলুদা।

মিলন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বলল, ঠাকুর্দার গাড়িটা পেলে মন্দ হত না।

যোগেশ্বর মুখ ভেঙে বললেন, মন্দ হত না ! তোমরা যাচ্ছ যাও, আমার গাড়ির দিকে নজর কেন বাপু ?

শর্মিষ্ঠা লাফিয়ে উঠেছিল মিলনের কথায়। আত্মরে গলায় বলল, দাও না দাও তোমার গাড়িটা।

যোগেশ্বর জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না।

মিলন বলল, বুঝতে পারছ না শমু ? ঠাকুর্দা ভাবছেন, তাঁর গাড়ির ঘাড় মটকে দেবে নন্দন কাননের ভূত।

যোগেশ্বর বিজ্ঞপ কানে নিলেন না। বললেন, যাই করো, কাজটা তোমরা ভাল করছ না ! একে তো চুরিচুরির বিপদে ভুগছি, তার ওপর যদি তোমাদের কিছু হয়—আমিই শেষপর্যন্ত মারা পড়ব ! সেই বলছি, যেও না।

মিলন বলল, বরং আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে ?

শর্মিষ্ঠা ভুরু কঁচকে তাকে নিঃশব্দে ভৎসনা করল। যোগেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাবার মুখ রেখেছে চোর ব্যাটাচ্ছেলেলা ? এই যে তোমরা যাচ্ছ—তোমাদের নিবেদন করছি, অথচ আমিও তো

একসময় প্রচণ্ড এ্যাডভেঞ্চারিস্ট ছিলাম। আমার কি মন মানছে ?
কিন্তু উপায় নেই।

শর্মিষ্ঠা বলল, মিলুদা ! পাঁচটা বেজে গেল। বাস ফেল করব কিন্তু।
মিলন বলল, চলো।

দুজনে বেরিয়ে গেটের কাছে গেছে, এমন সময় যোগেশ্বরের গলা
শোনা গেল।...ওয়েট, ওয়েট।

যোগেশ্বরের হাতে তাঁর বন্দুক। হতুদন্ত কাছে এসে বললেন, ভেবে
দেখলুম, তোমরা নিরস্ত্র হয়ে যাচ্ছ। এটা সঙ্গে নাও। এই কাতুর্জ-
গুলোও রাখো। কিন্তু সাবধান, মানুষের ওপর গুলি ছুঁড়ো না। কিছু
দেখলে-টেখলে যদি গুলি ছুঁড়তেই হয়, আকাশের দিকে ছুড়বে।

শর্মিষ্ঠা খুশি হয়ে বন্দুকটা নিল। কাতুর্জগুলো ভ্যানিটি ব্যাগে
ভরে রাখল। তারপর যোগেশ্বরের পায়ের ধুলো নিল। মিলনও।

যোগেশ্বর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।...বরং এক কাজ করা যাক।
চলো, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। রাতটা কাটিয়ে ফের সকাল
সাতটার মধ্যে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব। ভেবো না।

ভগু ঠাকুরের উদ্দেশে চৈঁচিয়ে বললেন, ভগু ! এক্ষুনি আসছি।
নজর রাখবে। গরুটর এলোও বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। সাবধান।

ভগু ঠাকুর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিল। বড় বড় দাঁত খুলে
হেসে মাথা দোলাল। সে টের পেয়েছে, ওনাদের কোথায় যাওয়া হচ্ছে।
এসব সময় সে ভারি খুশি।

যোগেশ্বর গাড়ি নিয়ে বেরলেন। খেলার মাঠের ধারে বটতলায়
জলি দাঁড়িয়ে ছিল। শর্মিষ্ঠা বলল, দাও, এক সেকেণ্ড। দাঁড় করাও
এখানে জলিকে তুলে নিই।

যোগেশ্বর ভুরু কুঁচকে জলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। জলি বলল,
ঠাকুর্দা কেমন আছেন ?

যোগেশ্বর থেকিয়ে উঠলেন। ঠাকুর্দা বলা হচ্ছে যে ? তোমার
বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি খেয়াল নেই বোকা মেয়ে কোথাকার ?
অলপয়েজু জে বলবে।

জলি হাসতে হাসতে বলল, সে তো বলি। যখন শয়্ম থাকে না, তখন। আপনার সঙ্গে আমার ছরকম সম্পর্ক।

যোগেশ্বর একথায় যেন সন্তুষ্টই হলেন। গাড়ির গতি ঈষৎ বাড়িয়ে দিলেন। হাইওয়ে বেশ চওড়া। দুধারে গাছপালা জঙ্গল হয়ে আছে। বিকেলের জালচে রোদে তাদের চেকনাই ফুটেছে। একটু পরে মন ভাল হয়ে গেল যোগেশ্বরের। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, জলি। তুমি তো বেশ গাইতে পারো। একথানা মনভালো করা গান গাও তো দিদি।

জলি বলল, গাইতে হলে সবাই মিলে গাইব।

মিলন বলল, নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি শুরু করুন।

শর্মিষ্ঠা বলল, একটা শর্ত। দাত্তকেও গলা মেলাতে হবে।

জলি গাইতে শুরু করলে মিলন ও শর্মিষ্ঠা গলা মেলাল। একটু পরে দেখা গেল, খেয়ালী মানুষ যোগেশ্বরের হেঁড়ে গলা বেশুরো হয়ে ভেসে উঠছে সেই কোরাসে।

বসন্তের বিকেলে নির্জন রাস্তায় চাপা শব্দ তুলে চলেছে পুরনো মডেলের কালো একটা গাড়ি।

হাইওয়ে থেকে নন্দন কানন পর্যন্ত প্রায় এক মাইল রাস্তাটা আর এখন রাস্তা হয়ে নেই। একশো বছর আগে পুণিয়ার জমিদার বাগান-বাড়িতে যাতায়াতের জন্য সংকীর্ণ একটা রাস্তা বানিয়েছিলেন। খোয়া ঢালা হয়েছিল। দুধারে অনেক গাছও লাগানো হয়েছিল। এখন রাস্তাটা খানাখন্দে হতভ্রী হয়ে গেছে। তবে জলকাদা নেই কোথাও। চৈত্রমাসে সব জলকাদা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু নন্দন কাননের সামান্য দূরে পৌঁছে রাস্তার অবস্থা একেবারে জঘন্য হয়ে রয়েছে। অনবরত খানাখন্দ আর এবড়োখেবড়ো মাটিতে টলতে টলতে অতিকষ্টে এগিয়ে যোগেশ্বরের গাড়ি শেষ পর্যন্ত আটকে গেল। শুধু তাই নয়, ধকলের চোটে বিগড়েও গেল। অনেক ঠেলাঠেলি করে নড়ানো গেল না। তখন হতাশ হয়ে যোগেশ্বর বললেন, কপালে তোমাদের সঙ্গে রাজিবাস

আছে। ভূতের কিল খাওয়াটাও আছে। চলো, এগোই। গাড়া
এখানেই থাক। সকালে দেখা যাবে।...

ভিন

ভাল আঁকিয়ে বলে মফস্বলে কৃতিবাসের প্রচুর খ্যাতি আছে। সম্প্রতি
তাকে নিয়ে রাজনৈতিক দলে টানাটানি শুরু হলে সে কতকটা গা
ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ছোটো দলের শাসানি খেয়ে তার
অবস্থা শোচনীয়। প্রথম প্রথম ছুদলেরই মন রাখতে পোস্টার এবং
ছবি রাশি রাশি ঐকেছিল সে। কিন্তু কোন দলই এমনটা চায় না।
যে কোন একটা দলে তাকে যোগ দিতেই হবে। চরম বিপদ ঘনিয়ে
এল দেয়ালপোস্টারে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ঐকে। একদলের চাপে কৃতিবাস
শহরের একটা স্কুলের একপাশের দেয়ালে প্রধানমন্ত্রীকে মা কালীর
চেহারা আঁকতে হয়েছিল হাতে খড়গ নিয়ে তিনি এলোকেশী ভয়ংকরী
হয়ে সর্বহারাদের মুণ্ড কাটছেন। অন্য পাশের দেয়ালে তিনি অনেকটা
মা সরস্বতীর অহিংস মূর্তিতে এক হাত তুলে বরাভয় দিয়ে অগ্নহাতে
বীণা বাজাচ্ছেন। ফিল্মস্টারের আদল। মুখটা কোন নায়িকার, তাও
লোকে চিনতে পেরেছিল।

কিন্তু এবার আর মন যোগান গেল না। একদল অন্যদলের দেয়াল-
চিত্র দেখে মহাখাপ্সা হয়ে কৃতিবাসের ওপর চড়াও হল। গতিক দেখে
কৃতিবাস গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে
একদিন সে ফরাসি ডাঙার বাগান বাড়িটা আবিষ্কার করেছিল। তারপর
তার মাথা খুলে গেছে।

এমন নিরাপদ আশ্রয় আর ছুটি নেই। সারাটা দিন এখানে
কাটানো যায়—কেউ টের পাবে না এবং রাত এলে চুপিচুপি আট
মাইল পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফেরা যায়। এবং একজন্ম একটা সাইকেলই
যথেষ্ট।

কৃতিবাসের একটা পুরনো ঠনঠনে সাইকেল জলের দামে কেনা ছিল।

বেকার যুবকের পক্ষে এর চেয়ে দামী সম্পত্তি থাকার কথা নয়। সেই সাইকেল চেপে কাকডাকা নিঃখুম ভোরে সে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে কিছু পাঁউরুটি, কলা বিস্কুট, কিংবা স্নেফ কয়েকটা চাপাটি আর আলুর-দম এবং একটা বড় ক্লাস্কে চা নেয়। তবে বেশি খিদে পেলে নন্দন কাননের কাছাকাছি মাঠের ক্ষেতে শকরকন্দ আলু কিংবা আখও মেলে। গঙ্গাতীরের মাটি বড় উর্বর। সেদিন একটা জমি থেকে মরশুমের শেষ মূলো উপড়ে খেতে গিয়ে কৃতিবাস চাষীদের তাড়া খেয়েছিল। ভাগ্যস ওরা তাকে জঙ্গলে খুঁজে পায়নি। তাছাড়া বাগানবাড়িটার প্রচণ্ড বদনামও আছে। যেই তারা বাগানবাড়ির কাছে এসেছে দোতলার একটা ঘর থেকে কৃতিবাস টুপ করে একটা মড়ার মাথা গলিয়ে ফেলে-ছিল। দেখা মাত্র লোকগুলো আঁতকে উঠে পালিয়ে যায়।

মড়ার খুলি নন্দন কাননের নীচে গঙ্গার চড়ায় পাওয়া যায়। পাশেই একটা শ্মশান আছে। কয়েকটা খুলি যে সে কুড়িয়ে এনে রেখেছিল, তার পেছনে কাকেও ভয় দেখানোর মতলব ছিল না কৃতিবাসের।

সে খুলিগুলোকে মডেল করে ছবি আঁকতে চেয়েছিল। সেদিন চমৎকার ভয় দেখানো গেল তাই দিয়ে।

সারাটা দিন সে নিরিবিলা ছবি আঁকে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছবি। সে ক্রমশ টের পেয়েছে, এই পোড়ো বাড়িতে আসার পর তার ছবি আঁকার হাত যেমন খুলে যাচ্ছে, তেমনি আঁকার বিষয়ও অদ্ভুত ভাবে বদলে যাচ্ছে।

ভয়ংকর এক অমানুষিক ও পৈশাচিক জগতকে সে যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে জগতের অনেকটাই অন্ধকার এবং এই চেনাজানা আলোকিত জগতের ক্ষীণ একফালি আলো গিয়ে পড়ে সেখানে। তাই দিয়ে দেখা যায় রহস্যময় ভীষণতম সব বস্তু এবং কিস্তুত প্রাণীকে।

এই কদিনে একগাদা এইসব ছবি সে একেছে এবং জীর্ণ পলস্তারখসা দেয়াল জুড়ে স্টেটে রেখেছে।

নন্দন কাননে ওপরে নিচে চব্বিশটে ঘর। ছাদের ওপরও একটা চিলেকোঠা আছে। ভেতরের সিঁড়ি কাঠের। নিচের প্রকাণ্ড হলঘর

থেকে সেটা দোতলায় উঠে গেছে। আরেকটা সিঁড়ি আছে বাড়ির বাইরে দেয়ালের গা বেয়ে। সেটা খুবই ঘোরালো সিঁড়ি এবং সংকীর্ণ। লোহার তৈরী সিঁড়িটা জং ধরে প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। দোতলায় উত্তরের একটা ঘর থেকে ওদিকে নামা যায়। কিন্তু সিঁড়ির নিচেই ইটের স্তূপ আর ঘন ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। ওখানে সাপের খোলস পড়ে থাকতে দেখে কৃতিবাস ওই সিঁড়ি বেয়ে নামার চেষ্টা করেনি।

প্রায় পাঁচ একর জায়গা জুড়ে বাড়ির এলাকা। চারদিকের পাঁচিল ভেঙেচুরে স্তূপ হয়ে রয়েছে। জঙ্গল আর জঙ্গল। এক সময়কার সুন্দর প্রাঙ্গণ আর বাগিচাতেও জঙ্গল। ভাঙ্গা ফোয়ারার ফাটলে কাশবন মাথা তুলেছে। এখন চৈত্রে সাদা কাশ ফুলগুলো হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের ভ্রম সৃষ্টি করে। কেন্দ্রের পরীমূর্তিটার নাক ভাঙ্গা। জলের কুন্ত নিয়ে নগ্ন দেহে ঝুঁকে আছে। কুন্তটার পেট খসে গেছে।

আর বাড়িটার অবস্থাও তেমনি প্রকৃতির করতলগত। আস্ত ঘর খুব কমই আছে। দরজা জানালা কবে লোকেরা খুলে নিয়ে গেছে। সব হাঁ করে রয়েছে। বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে দোতলার খানিকটা ধসে গেছে। বড় বড় কড়িবরগা ঝুলে রয়েছে। মাঝে মাঝে চুণগালি ঝরঝর করে ঝরে পড়ে।

শেয়াল, খটাস বেঁজি, ইঁদুর এবং তাই সাপেরও রাজ্য এখানে। পাখিও কম নেই। পায়রা, চামচিকৈ, দাঁড়কাক, চড়ুই—এমন কি, অগ্ন্যস্ত্র পাখিরাও ডিমপাড়ার ঋতুতে এই বাড়িতে বাসা বানায়।

পাশের গ্রামের একটা লোকের ওপর নন্দন কানন দেখাশোনার দায়িত্ব আছে। সে মাসে মাসে পূর্ণিয়া থেকে একসময় টাকাকড়ি নিয়মিত পেত। এখন পায় না বলে আর দেখতেও আসে না।

কৃতিবাসের প্রথম-প্রথম গা ছমছম করত। একটু শব্দেই চমকে উঠত। কিন্তু ক্রমশঃ সব সয়ে গেছে। তাই বলে এখানে রাত কাটানোর কথা সে ভাবতেও পারে না। সে লক্ষ্য করেছে, বেলা যখন ফুরিয়ে আসে, বাড়িটা যেন তত ঘুম থেকে জেগে উঠতে চায়। কী এক রহস্যময় নড়াচড়া শুরু হয় বাড়ির ভেতর। অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যেতে

থাকে। গঙ্গার ওপারে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা যেন এক অতিপ্রাকৃত শক্তির হাতে চলে যায়। গঙ্গার দিক থেকে দমকা হাওয়া ছুটে আসে। বোপবাড়ি গাছপালা ছলুছলু হতে থাকে। বাড়ির ভেতর ঘরে-ঘরে সেই হাওয়া বুনোঘোড়ার মতো ছুঁড়ু শব্দে ঢুকে পড়ে।

তখন কৃষ্ণিবাসের আর থাকার সাধ্য নেই। আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে সে কেটে পড়ে। সাইকেলে যেতে-যেতে বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখে নেয়। মনে হয়, নন্দন কাননে যত ছবি সে ঁকেছে সেই ছবির বিকট বস্তু ও কিস্তুত প্রাণীরা বেরিয়ে পড়েছে ছবি থেকে এবং প্রচণ্ড ছল্লোড় করে বেড়াচ্ছে।...

সেদিন তখনও সূর্য ডোবেনি। ঘড়িতে বাজছে প্রায় ছটা। দিন এখন বড় হয়েছে। বিকেলের লালচে রোদ পিচকিরির ধারায় গঙ্গার ওপার থেকে এসে ছড়িয়ে পড়েছে নন্দন কাননের ওপর। ছবি ঁকা শেষ করে কৃষ্ণিবাস ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখান থেকে বহুদূর নজরে আসে। প্রতিদিনই বাড়ি ফেরার আগে এখানে একবার এসে দাঁড়ায় সে। নিছক দৃশ্য উপভোগও বটে—আবার ফেরার রাস্তাটাও দেখে নেওয়া যায়, লোকজন আছে কি না। তার এই আস্তানার কথা টের পেলে রাজনীতিওয়ারা এখানে এসে তার ওপর জুলুম করবে।

কৃষ্ণিবাস পোড়ো রাস্তাটার দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার বুকটা ধক করে উঠল।

একটা কালো মোটরগাড়ি আসছে। অমন রাস্তায় মোটরগাড়ি আসার কথা ভাবাও যায় না। অথচ সত্যি সত্যি আসছে।

তাহলে কি রাজনীতিওয়ারা তার খবর পেয়ে গেছে? তাকে তুলে নিয়ে যেতে আসছে?

গাড়িটা একখানে আটকে গেল। তারপর কৃষ্ণিবাস আরও অবাক হয়ে দেখল, গাড়ি থেকে এক বড়ো ভদ্রলোক, দুটি যুবতী এবং একটি যুবক নামল। ব্যাপারটা কী? কৃষ্ণিবাসের ভয়টা চলে গেল। সে কৌতূহলী হয়ে ওত পেতে রইল।

ওরা গাড়িটা ঠেলাঠেলি করে নড়াতে পারল না। তখন গাড়িটা রেখে নন্দন কাননের দিকে হাঁটতে থাকল। একটি মেয়ের হাতে বন্দুকও রয়েছে। কুন্তিবাস হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

কাছাকাছি এলে কুন্তিবাস যোগেশ্বর ও জলিকে চিনতে পারল। অস্থ মেয়েটিকেও দেখেছে মনে হল। তারপর মনে পড়ে গেল, যোগেশ্বরের সেই কলকাতার নাতনি। আলাপের প্রশ্নই ওঠে না। যোগেশ্বর বড় কড়া দেমাকী লোক। কারুর সঙ্গে বিশেষ মেশেন না। তাছাড়া কুন্তিবাসের পুলিশ সম্পর্কে একটা চাপা ভীতি আছে। ভদ্র-লোক রিটার্ড পুলিশ অফিসার হলেও স্থানীয় পুলিশ ও শাসকমহলে প্রবল প্রতিপত্তি আছে, কুন্তিবাস জানে। সে এসব লোককে পছন্দও করে না। তার ধারণা, আর্ট এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে।

আরও কাছে এলে ব্যাপারটা বোঝবার জুড় কুন্তিবাস ঝটপট নেমে দোতলায় এল এবং এঘর-ওঘর হয়ে সাবধানে দক্ষিণের একটা ঘরের জানলায় ঊকি দিল।

যোগেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। হাত তুলে বাড়িটা দেখিয়ে গাইডের বক্তৃতার ঢঙে বললেন, এই হল সেই নন্দন কানন। অভিশপ্ত নন্দন কানন বলতে পার। ওখানেই একদল ডাকাত এসে রেঁদেভু করেছে খবর পেয়ে আমরা হানা দিয়েছিলুম।

শর্মিষ্ঠা বলল, কংকাল দেখেছিলে কোন ঘরে ?

হলঘরে না ঢুকলে দেখা যাবে না।...বলে যোগেশ্বর পা বাড়ালেন।

মিলন বলল, ভুত থাকা খুবই দরকার এমন পোড়বাড়িতে। থাকলে খণ্ড হয়ে পায়ের ধুলো নেব।

জলি ও শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল। যোগেশ্বর কড়া স্বরে বললেন, দিস ইজ নট জোক। সত্যি কিছু ঘটলে ঠেলা টের পাবে।

জলি বলল, ঠাকুর্দা রান্না করতে পারেন তো ? পিকনিকে রান্না করে না খেলে জমে না।

যোগেশ্বর বললেন, পারলেও এখানে রান্না করতে আমি আসিনি।

শর্মিষ্ঠা বলল, আগে একটা ঘর বেছে নেওয়া যাক। ও দাছ, ঘরগুলোর অবস্থা যে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে। ধসে পড়বে না তো ?

এতকাল যখন পড়েনি, আজ রাতে অন্তত পড়বে না। বলে মিলন দৌড়ে চওড়া সিঁড়িতে উঠল। সিঁড়ির মাথায় একটা ভাঙা কামান রয়েছে। সে কামানটার ওপর ঘোড়ার মতো বসল। জলি তার পাশে গিয়ে বলল, পক্ষিরাজ ঘোড়া ভাবলেন বুঝি ?

যোগেশ্বর হল ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। বললেন, শমু! এখানেই থাকা নিরাপদ মনে হচ্ছে। কড়িকাঠ আর দেয়াল মজবুত হয়ে আছে।

শর্মিষ্ঠা চারদিক দেখে নিয়ে বলল, হুঁ। ভাল জায়গা। কিন্তু নোংরা হয়ে আছে যে।

যোগেশ্বর বললেন, শতরঞ্জি পাতলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বাইরে মিলন তখনও কামানের ওপর বসে আছে। জলি পক্ষিরাজের কথা বলায় সে হাসতে হাসতে বলেছে, তাহলে আমি রাজপুত্র। রাজকন্যা—ধরুন, এই প্রসাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। আমি সব তেপান্তর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছি। তারপর...

জলি বলল, আপনার রাজকন্যা ঘুমোবার মেয়ে নয়। ওই দেখুন, কেমন কাজের মেয়ে। কোমরে আঁচল বেঁধে কাজে নেমেছে।

ঘুরে দেখে মিলন মুখ টিপে হেসে চাপা গলায় বলল, রাজকন্যাকে কেমন রান্ধুসীর মত দেখাচ্ছে না ?

জলি বলল, এই! বলে দেব কিন্তু।

মিলন ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, চুপ!

ভেতর থেকে শর্মিষ্ঠা ডেকে বলল—জলি, শুনে যাও।

জলি ঘরে গিয়ে বলল—বাঃ! দারুণ! কিন্তু রান্না হবে কোথায় ?

যোগেশ্বর বললেন, এখানেই হোক। ইঁটের উনুন বানিয়ে ফেল। এই আমি বসলুম। ভীষণ টায়ার্ড। তাছাড়া কাল রাতে একেবারে ঘুম হয় নি। হ্যাঁ, শোনো—আগে চা বা কফি করে ফেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লে জাগিয়ে দিও।

যোগেশ্বর দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে দিলেন।

জলি বলল, একটা কুকার আনা উচিত ছিল। অত বড় এক বালতি জ্বল আনা হল, কুকারের কথা ভুলে গেলে?

শর্মিষ্ঠা বলল, তাহলে আর পিকনিক কিসের? কখনও স্কাউটিংয়ে যাওনি?

গেছি।

তাহলে ভাবছ কেন? এখনও আলো আছে। কাঠ কুড়িয়ে আনো।

শর্মিষ্ঠা বেরিয়ে গেল। জলিও বেরুলো।

বাইরে গিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, বাঃ মিলুদা! তোমার অদ্ভুত ব্যাপার তো?

মিলন কামানটার ওপর সেইভাবে বসে রয়েছে। বলল, কী অদ্ভুত? চোখ পাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে শর্মিষ্ঠা হাসল।...ইঁট চাই উন্নয়ন করতে হবে। ওঠ।

মিলন অনিচ্ছাসহে উঠে সিঁড়ির ওপাশে ইঁটের তুপ থেকে কয়েকটা ইঁট তুলল। জলি বলল, আমি কাঠ আনি। শমু, ছুরি কোথায় রেখেছ? শর্মিষ্ঠা বলল, ছুরি দিয়ে কাঠ কাটবে? সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মিলন ঘরের ভেতর ইঁট রেখে এসে বলল, ঠাকুর্দা যুমিয়ে পড়েছেন।

তিনজনে আরেক দফা হাসল। তারপর শর্মিষ্ঠা বলল, চল। সবাই মিলে কাঠ খুঁজে আনি। তারপর আগে কফির ব্যবস্থা। কফি খেয়ে চাঙ্গা হওয়া দরকার।

ওরা জঙ্গলে শুকনো কাঠকুটো কুড়োতে গেল। তখনও রোদের আভা মিলিয়ে যায় নি। পাখিপাখালি ডাকছে। কোথায় কী ফুল ফুটেছে, তার মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। ভূতের কথা আর কারুর মাথায় নেই আপাতত।

হলঘরের বড় সিঁড়ির মাথায় হাঁটু দুমড়ে বসে তখন কুন্তিবাস রেলিঙের ফাঁক দিয়ে যোগেশ্বরকে দেখছে। শর্মিষ্ঠাদের কথাবার্তা সব সে শুনতে পেয়েছে। তার মনে প্রচণ্ড লোভ জেগেছে ওদের দলে ভেড়ার জন্য।

জীবনে যেন এক দারুণ আনন্দময় ঘটনা ঘটতে চলেছে—সে তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হাংলার মত।

কিন্তু যত ভয় যোগেশ্বরকে। উনি বাইরের কাকেও বরদাস্ত করবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া এই উচ্চবিত্তদের সামনে সে এক নেহাত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে। জঙ্গির সঙ্গে যদিও তার পরিচয় অল্পস্বল্প আছে, কিন্তু সে নিছক বাইরে-বাইরে। তাকে পরিচয় বলাও হয়তো ভুল।

কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক সমস্যা হচ্ছে, জলি তাকে এখানে দেখে নিশ্চয় ফিরে গিয়ে অশ্বদের কাছে গল্প করবে। তার ফলে কোনভাবে কথাটা চাউর হয়ে যাবে রাজনীতিওলা ছেলেদের কাছে।

তাই কুন্তিবাস বড় দ্বিধায় পড়ে গেছে। সে কী করা উচিত ভাবছে। তাছাড়া তাকে যদি বাড়ি ফিরতে হয়, এই হলঘর নিয়েই বেকরতে হবে। উত্তর-পূর্বের সেই সিঁড়ি দিয়ে প্রাণ গেলেও নামতে সে রাজি নয়। সাপের খোলস দেখেছে।

সাইকেলটা এই হলঘরের সিঁড়ির তলায় কোণার দিকে লুকোনো আছে। যোগেশ্বরের চোখে পড়বে। কাজেই তার রাত কাটানো ছাড়া উপায়ও নেই।

যোগেশ্বর হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন নাকি ? হঁ, নাক ডাকছে।

ব্যাপারটা দেখে কুন্তিবাস ভাবল একটা চান্স নেওয়া যাক। সে উঠল।

সাবধানে পা বাড়াল। কিন্তু একটা ভাঙা ধাপে পা পড়তেই সেটা মচমচ করে কেঁপে উঠল এবং একগাদা ধুলো-বালি ঝরে পড়ল।

অমনি যোগেশ্বর জেগে গেলেন। আঁতকে উঠে তাকিয়ে রইলেন সিঁড়ির দিকে। ভাঙা বিশাল দরজা জানলা দিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে শেষ রোদের ছটা এসে হলঘরে ঢুকেছে। কাজেই ভেতরে যথেষ্ট আলো রয়েছে এখনও।

পা তুলে কুন্তিবাস যেই পিছিয়ে গেছে, সেই ফের মচ মচ শব্দ এবং ধুলো-বালি ঝরে পড়ল অরেক দফা।

‘এবার যোগেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পকেট থেকে রিভলবার বের করে ফেললেন। দেখামাত্র কৃষ্ণিবাস দিঘিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে সরে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে নিজের আস্তানায় চলে গেল। এই ঘরটার আসতে হলে একটা বিপজ্জনক ভাঙা অংশ পেরুতে হয়। তাই এখানে ঝট করে কেউ তাকে খুঁজতে আসার রিস্ক নেবে না।

একটু পরে ভয় কেটে গেল কৃষ্ণিবাসের। যোগেশ্বরের কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিল না। ভয় কেটে ক্রমশ তার বাগ জাগল। তখন জানলার ধারে গিয়ে ইজ্যেলে একটা কাগজ কেটে যোগেশ্বরের সেই যুগ্ম শরীরের কার্টুন আঁকতে থাকল।

হলঘরে যোগেশ্বর তখন রিভলবার তুল সিঁড়ির কাছে এসে চোখ বড় করে ওপরের দিকে তাকিতে আছেন। মুখে চোখে অনেকগুলো ভাব খেলা করছে। কিছু আতঙ্ক, কিছু মরীয়াপনা কিছু রাগ। এবার কোন আওয়াজ হলেই ট্রিগারে চাপ দেবেন। রিভলবারটায় ছটা গুলি ভরা আছে।

বাইরে শর্মিষ্ঠার সাড়া পেয়ে দ্রুত রিভলবার পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। শর্মিষ্ঠা শুকনো কাঠ এনেছে। বলল, ওখানে কী করছ ?

যোগেশ্বর বললেন, দেখছি।

কী দেখছ ? ভুত নাকি ? শর্মিষ্ঠা হাসল। তারপর কাঠ রেখে দরজার এক পাশে উলুন বানাতে ব্যস্ত হল ইট দিয়ে।

যোগেশ্বর কাছে গিয়ে বললেন, ওরা কোথায় ?

আরও কাঠ চাই না ? মিলুদা গাছে উঠে শুকনো ভাল ভেঙে দিচ্ছে। জলি কুড়োচ্ছে।

যোগেশ্বর শতরঞ্জিতে বসে পড়লেন আগের মত। বললেন, খোঁয়া হবে না তো ঘরে ?

হোক না। শর্মিষ্ঠা বলল। ধরে নাও, এটা ফায়ারপ্রেস।

ফায়ারপ্রেসের চিমনি থাকে। যোগেশ্বর মন্তব্য করলেন।

শর্মিষ্ঠা ওপরে অশ্রুপাশে জানালা দেখিয়ে বলল, ওইটে আমাদের ফায়ারপ্লেসের চিমনি।

যোগেশ্বর চোখ বুজে বললেন, তাহলে কফি বানাও ঝটপট।...

গাছে চেপে মিলন শুকনো একটা মোটা ডাল ভাঙার চেষ্টা করছিল। নিচে জলি দাঁড়িয়ে আছে। রোদ কমে গেছে। বলল, থাকগে। ছেড়ে দিন. এই যথেষ্ট।

মিলন আরেকবার চাপ দিতে গিয়ে হঠাৎ কী দেখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

জলি বলল, কী দেখছেন?

একটা অদ্ভুত লোক।

অদ্ভুত মানে?

মানে ভূতের মত আর কী!

জলি এদিক ওদিক ভয়ের চোখে তাকিয়ে বলল, এই! বলবেন না। ভয় করছে।

মিলন শুকনো ডালটা মড়াং করে ভেঙে নিয়ে লাফ দিল। কাঁধে নিয়ে একটা ভজি করে বলল, আমায় থিয়েটারের ভীম দেখাচ্ছে না?

জলি বলল, কিন্তু আপনার অদ্ভুত লোকটা কোথায়?

ওই দিকে। বলে মিলন পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে ফোয়ারার ারীমূর্তির কাছে গিয়ে ফের বলল লোকটা সত্যি কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

কেন, কেন? জলি প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বোঝা যাচ্ছিল, মুখে যতই বড়াই করুক, ভূতপ্রোতের ভয় তার সামান্য নয়।

মিলন বলল, ওর ব্যাপারস্বাপার কেমন যেন। ঝোপের ভেতর থেকে মুখ বের করে আমাকে দেখছিল। মুখের গড়নটা...নাঃ। এক পলকের দেখা তো। আমারই চোখের ভুল। এক মিনিট। আমি দেখে আসি।

সে পা বাড়ালে জলি বলল, আমি...আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব? থাকুন না।

জলি লাজুক ভংগি করে বলল, আমার...আমার কেমন যেন ভয়
করছে।

মিলন অবাক হয়ে বলল, আমার ধারণা ছিল মফস্বলের মেয়েরা খুব
সাহসী। সর্বনাশ! এই ক্ষুধিত পাষাণের মত পোড়ো-বাড়িতে আপনি
তাহলে কী সাহসে এলেন?

এই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

টুপ করে কোথেকে একটা ঢিল এসে পড়ল জলির গায়ে! খুবই
ছোট ঢিল। আঘাত তত কিছু না, কিন্তু জলি অশ্রুট আঁর্তনাদ করে
মিলনকে ছুঁতে জড়িয়ে ধরল। মিলন ব্যস্ত এবং অপ্রস্তুত হয়ে বলল,
আরে, আরে! - কী ব্যাপার?

জলি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ঢিল।

মিলন হো হো করে হেসে উঠল। নিশ্চয় শয়্মু ছুঁঁমি করছে। কই,
ছাড়ুন তো দেখি। বলে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

জলি তাকে ছাড়ল না। ধরে থেকেই তাকে অনুসরণ করল।
ফোয়ারার পাশ দিয়ে কয়েক পা এগোলে কাঁকা জায়গায় ঘাসের জঙ্গল।
তারপর বাড়ির সামনের দিকের সিঁড়ি—যার মাথায় ভাঙ্গা কামান
রয়েছে।

শর্মিষ্ঠা ওদের ডাকবে বলে বেরিয়েছিল। আলোর রঙ এখন ধূসর।
দূরে কুয়াশার মত গাঢ় হয়েছে আসন্ন সন্ধ্যার রঙ। সিঁড়ির মাথায়
দাঁড়িয়ে ডাকতে গিয়ে শর্মিষ্ঠা পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে।

জলি মিলনকে ঘনিষ্ঠভাবে ছুঁয়ে রয়েছে। মিলন হেসে হেসে
তার সঙ্গে কথা বলছে। শর্মিষ্ঠার ভুরু কুঁচকে গেল। কয়েক মুহূর্ত
তাকিয়ে থাকার পর তার ঠোঁটের কোণাও কুঁচকে গেল। কেমন একটা
হাসি ফুটল। যাকে বাঁকা হাসি বলা যায়।

সে দ্রুত হলঘরে গিয়ে ঢুকল।

ষোগেশ্বর পেট্রোম্যান্স আলো আলাবার চেষ্টা করছেন। আলোটা
পুরনো। অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি। শর্মিষ্ঠা বুদ্ধি করে সঙ্গে
এনেছে। ভণ্ড ঠাকুর কেরোসিন পুরে নতুন বাতি পরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু যোগেশ্বর বাগে আনতে পারছেন না। হাঁটু ছমড়ে বসে পাষ্প করছেন। পিন ঘোরাচ্ছেন। আলো জ্বলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কফি তৈরি হয়ে গেছে। খিঁচুড়ি আর মাংস রান্না হবে। রান্নার দায়িত্ব জ্বলির। মসলাপাতি ভণ্ড ঠাকুর তৈরী করে দিয়েছে। উল্লুনের পাশে রীতিমত গৃহস্থালির থই থই অবস্থা ততক্ষণে। শর্মিষ্ঠা এসব কাজে ভীষণ আনাড়ি। অথচ পিকনিকের এমন আয়োজনে তার আনন্দখুব।

মিলন ও জলি ঢুকে দেখল শর্মিষ্ঠার মুখটা গম্ভীর। একবার তাকিয়ে দেখে সে বলল, কাঠ কোথায়?

মিলন তার কাঠটা দেখাল। জলি বলল, ওই যাঃ! আমার কাঠ-গুলো গাছতলায় পড়ে রইল যে।

মিলন হাসতে হাসতে বলল, অদ্ভুত ব্যাপার। গুঁর গায়ে একটা ঢিল পড়েছে নাকি। সেই ভয়ে উনি কাঠফাঠ ফেলে পালিয়ে এসেছেন।

যোগেশ্বর বললেন, ঢিল? কিসের ঢিল?

জলি চোখ বড় করে বলল, শুধু কি ঢিল? মিলনবাবু একটা ভুতুড়ে চেহারার লোককে দেখেছেন। ঝোপের কাঁকে মুণ্ড বের করে ওঁকে ভয় দেখাচ্ছিল।

যোগেশ্বর পাষ্প করতে করতে বললেন, হঁ। জলছে। জলতেই হবে। তারপর কফির কাণ্ডজে কাপে চুমুক দিতে দিতে নিজের জায়াগায় গেলেন। পেট্রোম্যাক্স ঘর প্রচুর আলো ছড়াচ্ছে। শেঁ। শেঁ। একটানা শব্দ হচ্ছে।

মিলন বলল, শমু! টর্চ কোথায়? কাঠগুলো নিয়ে আসি।

শর্মিষ্ঠা নীরবে ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে দিল। মিলন বেরিয়ে গেল।

জলি চাপা গলায় বলল, শমু! এ বাড়িটার যে বদনাম শুনেছিলুম হয়তো সত্যি।

শর্মিষ্ঠা কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে কেমন হাসল।

হাসছ যে? বিশ্বাস হচ্ছে না?

নিশ্চয় হচ্ছে। তবে আমি হলে গল্পটা আরও সাংঘাতিকভাবে বলতুম।

জলি কিছু না বুঝে হেসে ফেলল।

শর্মিষ্ঠা কাপ হাতে বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। বারান্দার বড় বড় থামগুলোর আড়ালে আবছা আঁধারের দিকে তাকিয়ে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু সে সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল। জঙ্গলেভরা প্রাঙ্গণে দূরে টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে। মিলন কাঠগুলো নিয়ে আসছে।

যোগেশ্বর ডাকছিলেন, জলি! কাম হেয়ার! তোমার ঢিল এবং অদ্ভুত মুণ্ডুর গল্পটা শুনি।

জলি কাছে গিয়ে বসল।...গল্প নয়, ঠাকুরদা। বিশ্বাস করুন।

বারান্দায় মিলন শর্মিষ্ঠার গায়ে টর্চ ফেলেছে! শর্মিষ্ঠা বলল, আঃ! কী হচ্ছে?

মিলন বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ি ভাঙছিল। উঠে এসে উত্তেজিতভাবে বলল, শমু! শমু! বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

শর্মিষ্ঠা বলল, চালাকি কোর না। এক্সপ্লানেশন চাই নি।

কিসের এক্সপ্লানেশন? অবাক হয়ে মিলন বলল। ব্যাপারটা শোন আগে। শুনব না।

কী হয়েছে বল তো শমু?

ভুতে ধরেছে। আঃ! আলো নেভাও।

মিলন আলো নেভাল। আবছা আঁধার জমেছে ইতিমধ্যে। সন্ধ্যা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঝাঁঝির ডাক শুরু হয়েছে। নদীর দিকে গাছপালার ভেতর পৌঁচা ডাকল।

মিলন বলল, বাইরে দাঁড়িও না। আমার মত ঢিল খাবে ভুতের হাতে।

বলে সে ভেতরে চলে গেল। কাঠগুলো রেখে দিলে জলি এগিয়ে এসে ওর কক্ষির পেয়ালাটা এগিয়ে দিল। মিলন চাপা গলায় বলল, আমিও ভুতের ঢিল খেলুম এইমাত্র।

সত্যি?

হ্যাঁ। তবে আমার মনে হচ্ছে, কেউ ছুঁমি করছে আড়াল থেকে।
বারান্দায় শর্মিষ্ঠাকে দেখা যাচ্ছিল পেট্রোমাস্কের আলোয়। জলি
ডাকল, শমু। ভেতরে এস। এবার রান্নার ব্যবস্থা করা যাক।
মিলন বলল, তাস এনেছি ঠাকুর্দা। তাস খেলতে পারেন তো?
যোগেশ্বর বললেন, তাস এনেছ এতক্ষণ বল নি? দাও, দাও।
আগে কিছুক্ষণ পেসেল খেলে নিই।

এই সময় শর্মিষ্ঠা ছিটকে চলে এসেছে ঘরের ভেতর। হাঁফাতে
হাঁফাতে বলল, টর্চটা দেখি। কেউ টিল ছুঁড়ল আগার গায়ে।
দেখাচ্ছি মজা।

সে মিলনের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে বেরুল। মিলন তাকে
অনুসরণ করল। বাইরে গিয়ে শর্মিষ্ঠা এদিকে ওদিকে আলো ফেলছিল।
কিন্তু কাকেও দেখতে পেল না। মিলন বলল কি? এসব বিশ্বাস হল
তো?

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। কৃত্তিবাস সাবধানে টর্চ জ্বলে
পা বাড়াল। এঘর-ওঘর ঘুরে সিঁড়ির মাথায় এল। রেলিঙের কাঁক দিয়ে
তাকাল।

আঃ! কি সুন্দর গন্ধ ছুটেছে রান্নার। জলি রান্না করছে।
যোগেশ্বর আর যুবকটি তাস খেলছে। যোগেশ্বরের কলকাতার নাতনি
গস্তীর মুখে বসে উপভাস পড়ছে। হাতে টচ। হলঘরে প্রচুর আলো
ছড়িয়ে পেট্রোমাস্ক জ্বলছে।

কিন্তু কৃত্তিবাস ক্ষুধার্ত। খাওয়ার মিঠে গন্ধে তার নোলায় জল
আসছে। ইচ্ছে করছে, গিয়ে দলে ভিড়ে যায়। তবু সাহস পাচ্ছে
না। তার ওপর যোগেশ্বরের হাতে তখন রিভলবার দেখেছে। সেই
থেকে ভয়টা বেজায় বেড়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল, সাইকেল চুলোয় যাক। তাকে যে
কোন উপায়ে এখান থেকে বেরতে হবে। পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে

নামবে। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই দৌড়ে ফুরুং করে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে ফের তখনকার মতো মচমচ শব্দ হল। ঝরঝর করে কিছু ধুলোবালি ঝরে পড়ল।

যোগেশ্বর ও মিলন আপনমনে তাস খেলছেন। কানে ঢুকল না আওয়াজ। জলিও রান্নার ঝোঁকে ব্যস্ত। শুনতে পেল না। শুধু শুনল শর্মিষ্ঠা। সে তাকাল এবং বই বুজিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। টর্টটা নিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে গেল।

কুন্তিবাস সরে গেল ফের শব্দ হল। তখন সাহসী মেয়েটা সিঁড়িতে উঠতে শুরু করল। নিচে কেউ সেটা টের পাচ্ছিল না।

চার

ওপরে উঠতে উঠতে টর্টের আলোয় শর্মিষ্ঠা এক পলক দেখেছিল কুন্তিবাসকে। কিন্তু ওপরের ঘরে এপাশে ওপাশে আলো ফেলে কাকেও দেখতে পেল না। আর তখন সে ধাঁধায় পড়ে গেল তাহলে কি চোখের ভুল ?

তার ভয় করছিল না বললে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু সে একরোখা মেয়ে। প্রথমে বাঁদিকের ঘরগুলো ঘুরে ডানদিকে চলে গেল। বিপজ্জনক হয়ে আছে কোন কোন ঘরের অবস্থা। গোলকধাঁধার মতো মনে হচ্ছিল ঘরগুলো। এবার বিপদ হল চিনে বেরিয়ে আসা।

পা বাড়াতে গিয়ে কি একটা শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। আলো ফেলে দেখল, একটা চামচিকে পড়ল এইমাত্র। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে সামনে পড়ে গেছে।

সে একটু দাঁড়িয়ে চামচিকেটাকে দেখে পা বাড়াল। এ ঘরের ছাদটা প্রায় খসে যাওয়ার অবস্থা। কড়িবরগা বেঁকে গেছে। ভয়ে ভয়ে কিছুটা এগিয়ে সে একটা ঘর পেল। অলো ফেলেই অবাক হয়ে গেল শর্মিষ্ঠা।

ঘরের ভেতর ছড়ানো অজস্র টুকরো কাগজ জানলার ধারে এক গাদা রঙের টিউব। জলের পাত্র। এক কোণে ইজ্জলে একটা কার্টনের মতো ছবি।

ভেতরে চারদেয়ালে আলো ফেলে শর্মিষ্ঠা আরও অবাক হয়ে দেখল অসংখ্য ছবি দেয়ালে আটকানো রয়েছে। অদ্ভুত সব ছবি! ভয়ংকর প্রাণী—মানুষের মতো, অথচ মানুষ নয়। ছবিগুলো দেখতে দেখতে তার অবচেতনা থেকে একটা আতংক জেগে মনের চেতন অংশকে গ্রাস করছিল ক্রমশঃ।

এই সময় বাইরে শনশন শব্দ করে বাতাস উঠল। বাতাসটা বাড়তে থাকল। তারপর দমকে দমকে সেই বাতাস ঘরে ঢুকলো। টুকরো কাগজগুলো উড়তে শুরু করল। বাইরে গাছপালার শনশনানি, ঘরে কাগজ ও ধুলো উড়ছে, দেয়ালের ছবিগুলো কাঁপছে। ছবির প্রাণীগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠছে যেন। একেকটি ভয়ংকর মুখ নড়ছে গর্জন করার ভংগিতে। বিকট তাদের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন! শর্মিষ্ঠার চোখ নিস্পলক হয়ে উঠেছিল। বুকের ভেতর কী এক অজানা আতংক হৃদপিণ্ডকে নাড়া দিচ্ছিল। টর্চের আলো কাঁপছিল তারপর ছবির ভয়ংকরেরা যেন ছবি থেকে বাঁপ দিয়ে মুখব্যাদান করে তার ওপর পড়তে চায় টের পেয়ে শর্মিষ্ঠা আর নার্ভ ঠিক রাখতে পারল না। সে বোবায় ধরা গলায় একটা চাপা চিৎকার করে উঠল। তার মাথা ঘুরে গেল। হাতের টর্চ ছিটকে পড়ল।

পড়ে যাবার মুহূর্তে কেউ পিছনে তাকে ধরে ফেলতেই শর্মিষ্ঠার আচ্ছন্নতা কেটে গেল। সে শব্দ : নের মেয়ে। ছিটকে সরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মেঝের টর্চটা কাত হয়ে জ্বলছে। শর্মিষ্ঠা দেখল একটা যুবক কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

শর্মিষ্ঠা টর্চটা দ্রুত কুড়িয়ে নিয়ে তার আপাদমস্তক দেখে বলল, কে আপনি? কৃত্তিবাস অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের ভয় দেখাতে চাইনি।

শর্মিষ্ঠা ধমকের সুরে বলল, আপনি কে ?

মানুষ। ভূতপ্রেত নই, সেটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

এই ছবিগুলো আপনি এঁকেছেন ?

ওই একটু অভ্যাস আর কি !

নাম কি ? কোথায় থাকেন ? এখানে এই পোড়ো বাড়িতে ছবি আঁকেন কেন ?

একে একে জিগ্যেস করুন। জের! করলে জবাব দেওয়া কঠিন।

শর্মিষ্ঠা ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল। বলল, বেশ। আগে নাম বলুন।

কুন্তিবাস মুখার্জি। থাকি ওই শহরে—যেখানে আপনার দাছর বাড়ি। আর এই পোড়ো বাড়িতে এসে ছবি আঁকার কারণ, নিরিবিজি ছবি আঁকতে ভাল লাগে।

শর্মিষ্ঠা আলাপের সুরে বলল, আপনার টেস্ট আছে। প্রশংসা করা যায়। কিন্তু এমন ভয় দেখানো ছবি আঁকেন কেন ?

পৃথিবীকে আমি প্রচণ্ড ভয়ের জায়গা মনে করি বলে।

শর্মিষ্ঠা হেসে উঠল। কিন্তু ওইসব বিদ্যুটে জন্তুগুলো কোন পৃথিবীর বাসিন্দা বলুন তো ? ওদের তো এ পৃথিবীতে দেখা যায় না।

এই পৃথিবীতেই দেখা যায়। লক্ষ্য করে দেখুন—বুঝতে পারবেন। হঠাৎ দেখে ভয় পাবেন—পেয়েছিলেনও। সেটা বুঝতে পারেন নি বলে। এবার দেখুন, প্রত্যেকটি মুখ আপনার চেনা মনে হবে।

কুন্তিবাস সিগারেট ধরাল। শর্মিষ্ঠা ঘুরে-ঘুরে ছবিগুলো ফের দেখতে শুরু করল। কিন্তু এবার সে ভয় পাচ্ছিল না। বরং হাসি পাচ্ছিল তার। ইজেলের সামনে গিয়ে কার্টুনটা দেখেই সে প্রায় চৈতন্যে উঠল, এ কী ! কাকে এঁকেছেন ?

কুন্তিবাস এগিয়ে গিয়ে বলল, ভাল করে দেখলে চিনতে পারবেন।

শর্মিষ্ঠা জোরে হাসল।...চিনেছি। দাছ। কখন আঁকলেন ?

সন্ধ্যার আগে উনি যখন হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলেন।

শর্মিষ্ঠা এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বলল, আশ্চর্য মানুষ তো আপনি। উঁকি মেরে দেখছিলেন বুঝি ? দাছ দেখতে পেলে

কিছু না বুঝে গুলি ছুঁড়ে বসত জানেন? আপনি আলাপ করতে
গেলেন না আমাদের সঙ্গে?

কৃত্তিবাস বলল, সেটাই সমস্যা।

কী সমস্যা বলুন তো?

বলতে গেলে সময় লাগবে।

লাগুক। শুনব।

আপনার টর্চটার আলো কমে আসছে। নিবিয়ে রাখুন।

শর্মিষ্ঠা টর্চ নেভাল। বলল, এবার বলুন।

কৃত্তিবাস বলল, বরং ছাদে চলুন না। চমৎকার জায়গা। ভাল
লাগবে আপনার।

শর্মিষ্ঠা বলল, কিন্তু এতক্ষণ হয়তো আমার জন্ম ওরা হৈ-চৈ
বাধিয়েছে।

কৃত্তিবাস হাসতে হাসতে বলল, বাধাক না। লুকোচুরির এমন
চাল ছাড়বেন কেন?

ঠিক বলেছেন। চলুন।...

পা বাড়িয়ে শর্মিষ্ঠা ফের বলল, আচ্ছা, আপনি যে এ বাড়িতে
রাত কাটান, ভূত-প্রেত দেখেন নি কখনও?

আমি তো রাতে এখানে থাকি না। ভূত না দেখলেও ভূতের ভয়
আমার প্রচুর।

আজ আছেন কী সাহসে তাহলে?

সেটাই বলব। ছাদে চলুন। হ্যাঁ, সাবধানে আসবেন। বরং টর্চটা
আমায় দিন।

শর্মিষ্ঠা ওকে টর্চ দিল।...

হলঘরে যোগেশ্বর ও মিলন তাসে মগ্ন। মাঝে মাঝে তাস জিতে
যোগেশ্বর বাচ্চা ছেলের মত ফিকফিক করে হাসছেন। মিলনের মন
কিন্তু জলির দিকে। বারবার আড়চোখে অদূরে জলির দিকে তাকাচ্ছে।

জলিও সাবধানে তাকাচ্ছে। সেটা প্রেমে হয়তো নয়, খেয়ালে।
কিংবা সুন্দর যুবকের দিকে লুকিয়ে তাকানোর ইচ্ছা যুবতীদের পক্ষে

স্বাভাবিক। জলি টের পেয়েছে, সে মিলনকে তখন ওইভাবে জড়িয়ে ধরেছিল এবং তার গা ঘেঁষে আসছিল, সেটা শর্মিষ্ঠার চোখে পড়েছে। তাই শর্মিষ্ঠার মুখটা কেমন গম্ভীর।

ঘাড় ঘুরিয়ে শর্মিষ্ঠাকে দেখতে চাইল সে। কিন্তু দেখতে পেল না। ভাবল, তাহলে নিশ্চই কামানটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শর্মিষ্ঠার সাহস যে আছে, তা সে জানে। আঙু ও টের পেয়েছে তা।

জলি একবার নির্ভয়ে মিলনের দিকে তাকাল। মিলনও তাকাল। দুজনেই কারণে বা অকারণে একটু হাসল।

যোগেশ্বর ডাকলেন, শমু! জলি! তোমাদের রান্না হয়ে থাকলে চলে এস। আমরা ত্রে খেলব। নৈলে জমছে না।

মিলন ঘুরে দেখে বলল, শমু কোথায় গেল? শমু!

যোগেশ্বরও ডাকলেন, ও শমু! কোথায় গেলি?

কোন সাড়া এল না। জলি বলল, রাগ করেছে নাকি? হয়তো বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিলন বলল, কী সর্বনাশ! সে তক্ষুণি উঠে হস্ত-দস্ত বেরিয়ে গেল। কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে দেখতে পেল না। বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। চৈত্ররাতের উদ্দাম বাতাস বইছে। গাছপালা ঝোপঝাড় তুলছে।

জলি ডাকল, মিলনবাবু! কী করছে শমু?

মিলন ফিরে এসে বলল, আশ্চর্য মেয়ে তো! আপনার কাছে টর্চ আছে? শমু টর্চ নিয়ে কোথায় গেল হঠাৎ?

জলি টর্চ দিয়ে একটু হেসে বলল, শমু নিশ্চয় ভূতের খোঁজে বেরিয়েছে।

মিলন বাইরে গিয়ে প্রাঙ্গণ ও বাগানে টর্চের আলো ফেলে কয়েকবার ডাকাডাকি করে কোন সাড়া পেল না। ফিরে এল হলঘরে। বলল, কোথায় গেল ও?

যোগেশ্বর উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, সে কী! গেল কোথায়? হতচ্ছাড়া মেয়েটা...

জলি বলল, মিলনবাবু, ভূত দেখবে বলে দোতলায় ওঠেনি তো?

ওর বড় ডানপিটেমি আছে। আমি জানি।

যোগেশ্বর বললেন, মরবে। নির্ধাৎ মরবে তাহলে। ভূতে ঘাড়টি মটকে দেবে যখন, তখন বুঝবে ঠ্যালা! আমার কী? আমি পোসেল খেলতে বসলুম। যা বোঝ, করো সব।

মিলন বলল, দোতলাটা খুঁজে দেখা দরকার। বলে সে জলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? একা কেমন যেন লাগছে—মানে তখন ঢিল খাওয়ার পর থেকে ভূতে বিশ্বাস দানা বাঁধছে।

ওর চোখে তুঁটুমি খেলা করছিল। জলি বলল, আমারও। তা বলছেন যখন, যাব।

যোগেশ্বর তাস সাজাতে সাজাতে বললেন, বন্দুকটা নিয়ে যাও ভায়া।

মিলন বলল, থাক।

তুঁজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। মিলনের গা ঘেঁষে পা ফেলছিল জলি। তিনটে ঘর খুঁজে যেখানে পৌঁছল, সেখানটা চওড়া একটা ব্যালকনি মতো চাতাল। অনেকগুলো থাম রয়েছে। মিলন বলল, কোথায় গেল শমু?

এই সময় কোথায় ঘষ ঘষ আওয়াজ হল। একটা ঘষটানোর শব্দ। শোনা মাত্র জলি মিলনকে জড়িয়ে ধরল। মিলন বলল, এত ভয় কেন আপনার?

জলি ফিসফিস করে বলল, ও কিসের শব্দ?

মিলন হাসল। শমু ভয় দেখাচ্ছে না তো আমাদের?

জলি সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে গিয়ে বলল, বলা যায় না।

চলুন, দেখি—শব্দটা ওদিকেই শুনলুম মনে হল।

তুঁজনে আবার এগোল। চত্বর ঘুরে আবার একটা ঘর। ঘরের পর ঘর। ভাঙাচোরা অবস্থা প্রত্যেকটার। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে কোথেকে। জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলার মত। জলি চমকে উঠে বলছে, ও কি? মিলন বলছে, বাতাসের শব্দ।

দক্ষিণের শেষ ঘরটায় পৌঁছে মিলন বলল, আশ্চর্য! শমু গেল

কোথায় বলুন তো ?

জলি বলল, চলুন। ওপরে আসেনি নিচে কোথাও আছে। নিচের তলাতেও তো অনেক ঘর আছে।

তুজনে হলঘরের সিঁড়ির মাথায় এসেছে। এমন সময় নিচে খুড়ুম করে শব্দ হল। বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। তারপর যোগেশ্বরের গলা শোনা গেল। কাম অন! কাম অন ইউ স্কাউণ্ডেল।

তুজনে সিঁড়িতে হস্তদণ্ড হয়ে নামতে থাকল। মিলন বলল, কি ব্যাপার ঠাকুর্দা? কাকে গুলি করলেন?

যোগেশ্বর রিভলবার হাতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, কেউ কোঁস কোঁস করছিল ওপাশে। হুঁ, পেলে শমুকে?

না তো।

বড্ড তুষ্টু মেয়ে, বুঝলে? যোগেশ্বর রিভলবার পকেটে পুরে বললেন। বরাবর ওইরকম। মরুক গে, আমার কী! তবে ভূত হোক আর যেই হোক, আমায় ভয় দেখালেই আমি গুলি ছুঁড়ব।

মিলন বলল, আমার দৃঢ় ধারণা, শমু আমাদের ভয় দেখাচ্ছে তুষ্টুমি করে।

জলি সায় দিয়ে বলল, ঠিক তাই।

যোগেশ্বর অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করলেন। পায়চারি করতে করতে বললেন, এমন করবে জানলে কক্ষনো আনতুম না। একে আগার অমূল্য জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেল, সেই নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে আছে। তার ওপর গাড়িটা বিগড়ে পড়ে রইল বন-বাদাড়ে। এতক্ষণ ওটাও চুরি গেল কিনা কে জানে। এদিকে হতচ্ছাড়া মেয়েটার বাঁদরামি। আর কক্ষনো ওর কথা শুনব ভেবেছ? নেভার, নেভার।

মিলন জলির দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন না। নিচে তলার ঘরগুলো খুঁজে দেখি। শমু যদি লুকোচুরি খেলতে চায়, আমরাও খেলব।

জলি বলল, চলুন।...

ছাদে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণিবাস গুলির শব্দ খুব আবছা ভাবে শুনেছিল। কিন্তু আমল দেয়নি। ছাদে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে তার ফলে অণু কোন শব্দ কানে আসার কথা নয়।

সব শোনার পর শর্মিষ্ঠা হেসে খুন। বলেছিল, আপনার সমস্যা ভারি অদ্ভুত।

কৃষ্ণিবাস বলেছিল অদ্ভুত হলোও এটাই আজকাল স্বাভাবিক।

শুনুন, আপনি কলকাতা যাবেন ?

কেন ?

বাবাকে বলে আপনাকে কোন কমার্শিয়াল ফার্মে কাজ পাইয়ে দিতে পারি। ধরুন, কোন এ্যাডভার্টাইজিং কনসার্নে। আপনি এত ভাল আঁকেন।

চেষ্টা করব যেতে।

চেষ্টা নয়। আমাব সঙ্গেই চলুন না। পরশু আনি ফিরব।

উঠব কোথায় ?

আমাদের ওখানে। সে-সব ভাববেন না। শর্মিষ্ঠা পা বাড়িয়েছিল এতক্ষণে। এবার চলুন, আপনাকে ওদের সামনে হাজির করি। আপনার নিশ্চই ক্ষিদে পেয়েছে।

কৃষ্ণিবাস বলেছিল, পেয়েছে। বিশেষ করে সুন্দর গন্ধে।

দুজনে হাসতে হাসতে নেমেছিল। তারপর কৃষ্ণিবাসের হবির ঘরে এসেছে, এমন সময় নিচে চাপা ফৌঁস ফৌঁস শোনা গেল। দুজনেই চমকে উঠে বলল, ও কিসের শব্দ ?

শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। শর্মিষ্ঠা ইজেল থেকে যোগেশ্বরের কার্টুনটা নিল। তারপর দুজনে ফের চলতে শুরু করল। আগে কৃষ্ণিবাস, পেছনে শর্মিষ্ঠা। হলঘরের ওপর এসে সিঁড়ির কাছে বুকু কৃষ্ণিবাস ফিসফিস করে বলল, আপনার ঠাকুর্দা একা তাস খেলছেন। ব্যাপার কী ? ওঁরা গেলেন কোথায় ?

শর্মিষ্ঠা শব্দ মুখে বলল, অভিসারে গেছে। আবার কোথায় যাবে ?

কৃষ্ণিবাস আস্তে বলল, যাঃ। কী যে বলেন ! হয়তো আপনাকে

খুজতে বেরিয়েছে ?

শর্মিষ্ঠা শব্দ তুলে সিঁড়িতে নামতে থাকল। যোগেশ্বর মুখ তুলেছেন। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছেন। শর্মিষ্ঠা ঘুরে দেখল, কৃতিবাস দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, দাঁড়িয়ে কেন ? আসুন না।

যোগেশ্বর বললেন, হুঁ। ছিলে কোথায় ? ভূতের আড্ডায় বুঝি ? বলেই কৃতিবাসের দিকে চোখ পড়ল। তাকিয়ে রইলেন। ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন যোগেশ্বর। কৃতিবাস করজোড়ে নমস্কার করে বলল, নমস্কার স্যার।

যোগেশ্বর জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি কে হে বাপু ?

আমি কৃতিবাস—মানে,

শর্মিষ্ঠা আলাপ কারানোর ভঙ্গিতে নামধাম জানিয়ে দিল। যোগেশ্বর বললেন, তা ওহে কৃতিবাস। এ পোড়োবাড়িতে কি ভুতুড়ে রামায়ণ লিখতে বসেছ ? ভূতায়ন ?

শর্মিষ্ঠা ধমকের সুরে বলল, আঃ দাঃ। অভদ্রতা করো না। ইনি একজন অর্টিস্ট। চমৎকার ছবি আঁকেন।

কী ? ছবি ? যোগেশ্বর প্রশ্ন করলেন। কিসের ছবি ? ভূতের ?

কৃতিবাস সবিনয়ে বলল, ঠিক বলেছেন। ভূতের ছবি আঁকি।

এই যে, এখানে বসো। যোগেশ্বর শতরঞ্জির একপাশটা দেখিয়ে দিলেন। দেখ বাবু, ভূতের ছবি আঁকতে সবাই পারে। মামুষের ছবি আঁকাটা সহজ নয়। একটা গোলা একে ভূতের মুণ্ডু করে ফেল। নাক চোখ দাঁত, বড় বড় কান একে দাও। এই যে এভাবে। খুব সোজা।

পকেট থেকে ডাইরি বের করে ডটপেনে ভূতের মূর্তি একে দেখিয়ে দিলেন।

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে সেই কাটুনটা দেখিয়ে বলল, দেখ তো এ কার ছবি ?

যোগেশ্বর দেখতে থাকলেন। বললেন, চেনাচেনা মনে হচ্ছে। অথচ বেয়াড়া ভুতুড়ে চেহারা। নিশ্চয় মামদো ভূতের ?

কৃতিবাস লজ্জায় পড়ে গেছে। কাঁচুমাচু মুখে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

শর্মিষ্ঠা বলল, ওটা তোমার ছবি দাও। চিনতে পারছ না ?

হোয়াট ? যোগেশ্বর খান্না হয়ে বললেন।

কুন্তিবাস কী বলতে যাচ্ছে এমন সময় ওপাশের ঘরে ধূপধূপ শব্দ শোনা গেল। তারপর টর্চের আলো বলসে উঠল। মিলন ও জলি দৌড়ে এসে হলঘর ঢুকল। দুজনেই হাঁকাচ্ছে।

মিলন শর্মিষ্ঠাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। শর্মিষ্ঠা মুখ টিপে হেসে বলল, ভূতে তাড়িয়েছে বুঝি ?

জলি হাঁকাতে বলল, অদ্ভুত ব্যাপার ! তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ টর্চের আলোয় দেখি, একটা মড়ার খুলি গড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

মিলন বলল, স্বচক্ষে দেখলুম। দরজা দিয়ে গড়াতে গড়াতে ঘরে ঢুকল।

কুন্তিবাস বলল, মড়ার খুলি ?। কত মড়ার খুলি তো....

মিলন বাধা দিয়ে বলল, আপনাকে তো চিনলুম না ?

শর্মিষ্ঠা বলল, উনি কুন্তিবাস মুখার্জি। বিখ্যাত পেণ্টার। উনি এ বাড়িতেই একটা স্টুডিও করেছেন। নিরিবিলা জায়গা ছাড়া ইমাজিনেশন খোলে না। ব্যস, আর কী জানতে চাও ?

কুন্তিবাস বলল, শর্মিষ্ঠা, আপনার টর্চটা দিন তো—আসছি।

শর্মিষ্ঠা বলল, কোথায় যাবেন ?

আমার ঘরে।

কেন ?

আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে। বলে হাত বাড়িয়ে টর্চ নিল কুন্তিবাস।

শর্মিষ্ঠা বলল, ব্যাপারটা কী ?

ফিরে এসে বলল। কুন্তিবাস চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে। তার ঘরে মড়ার মাথা ছিল। মডেল হিসেবে রাখা আছে। সেই খুলি নিচের তলায় জ্যাস্ত হয়ে গড়িয়ে বেড়ানোর মানেটা কী ?

কুন্তিবাস তার ঘরে গিয়ে দেখল, খুলিগুলো একটাও নেই। কেউ চুর করে নিয়ে গেছে—নাকি সত্যি ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটেছে ?

একা ঝাঁকের মাথায় এসে সে এবার খুব ভয় পেয়ে গেল। তখন

হস্তদস্ত ফিরে চলল শর্মিষ্ঠাদের কাছে।

আবার সেই ফৌস ফৌস শব্দটা শোনা যাচ্ছিল। হলঘরে যোগেশ্বর বাদে সকলের মুখে উত্তেজনার ভাব। যোগেশ্বর বললেন, বাতাসের শব্দ। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আসলে আমারই ভুল হয়েছিল তখন। এ বাড়িতে এমন সব বিদ্যুটে শব্দ সেবার আমরা শুনেছিলুম। ডাকাত ধরতে এসেছিলুম। যেবার।

আচমকা কোথাও ঠং ঠং করে কী যেন পড়ে গেল। তারপর খ্যাং খ্যাং করে ক্যানেক্সার পেটাতে থাকল কেউ। জলি আতংকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। মিলন ফিস ফিস করে বলল, কৃত্তিবাসবাবু ওপরের ঘরে কিছু করছেন হয়তো।

জলি বলল, না না। মনে হচ্ছে এই নিচের তলায় শব্দটা হচ্ছে।

মিলন কান পেতে শুনে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে।

শর্মিষ্ঠা বন্দুকটা তুলে নিয়ে বলল, জলি, তোমার টর্চটা দাও। আমি দেখে আসি।

জলি বলল, না, না। যেও না শমু!

যোগেশ্বর ফের তাসের সামনে বসেছেন ততক্ষণে। তাস চালতে চালতে বললেন, ওকে বাধা দিও না। যাক। ভূতের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে আশুক। ঠেলাটা টের পাবে'খন।

টর্চ নিয়ে, বন্দুক বাগিয়ে শর্মিষ্ঠা চলে গেল পাশের ঘরে—যেদিকে শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ঠং ঠং শব্দ থেমে গেল হঠাৎ। শুধু ফৌস শব্দ খামল না। শর্মিষ্ঠা সাবধানে এগোল। পরের ঘর পেরিয়ে পরেরটাতে যেতেই সে টর্চের আলোয় দেখল, মেঝেয় একটা মড়ার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখামাত্র চমকে উঠেছিল। তারপর সামলে নিল। নির্ভয়ে খুলিটাকে লাথি মারল। তারপরই শুরু হয়ে গেল একটা হুলস্থূল কাণ্ড।

কড় কড় কড়াং করে মেঘ ডাকল। বাইরে থেকে সেই দমকা হাওয়া চৌকুণ বেড়ে গেল হঠাৎ। খোলা দরজা জানলা দিয়ে ঘূর্ণি ঝড়

টুকল শনশনিয়ে। ধুলোবালি উড়ল। ঘুরপাক খেতে থাকল ধুলো-
বালির সঙ্গে পোড়োঘরের টুকরোটাকরা সব আবর্জনা। আবার মেঘ
ডাকল। বিছাতের ছটা মুহুমুহু ঘরের ভেতর তীব্র তীব্র একটা সাদা
ও নীল রেখা টেনে মিলিয়ে যেতে থাকল। নন্দন কাননের অশরীরীদের
ঘুম ভেঙে গেছে যেন। অদ্ভুত শব্দ সারা বাড়িতে। কোথাও কিছু
পড়ে যাওয়ার, কিছু ঘষটে নিয়ে যাওয়ার, ঠং ঠং, ঘষ ঘষ, ঝাঁস ঝাঁস,
দড়াম্ দড়াম্ কর রর কট্ কট্ কট্ কট্...ঘটাং ঘট্ ঘটাং ঘট্...ঝন্ ঝন্
ঝন্ ঝন্...

ঘরের ভেতর ঘুরপাক খাওয়া ধুলোবালির মধ্যে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে
গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। তার পরনের শাড়ি কিছুটা লেপ্টে গেছে গায়,
কিছুটা পালের মত উড়ছে। হকচকিয়ে যাওয়ার ফলে টর্চের বোতাম
থেকে আঙুল সরে গেছে। টর্চটা গেছে নিভে।

সে ফের টর্চের বোতাম যেই টিপেছে এবং আলো জ্বলেছে, আচমকা
পেছন থেকে কেউ তার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিল। এবং বন্দুকটাও।

তারপর কেউ অমাব্যুধিক একটা হাসি হাসতে হাসতে অন্ধকারের
ভেতর মিলিয়ে গেল। এমন ভয়ংকর, বিদঘুটে, নাকিস্বরের হাসি
শর্মিষ্ঠা কখনও শোনেনি।

সেই মুহূর্তে যোগেশ্বর, মিলন ও জলির ডাক শুনতে না পেলে সে
তখনকার মতো পড়ে যেত।

ওরা ডাকছিল শমু! শমু! শমু! কিরে এস!

বাইরে ঝড়ই বটে। বারবার মেঘ ডাকছে। কালবোশেখী এসে
গেছে সবার অলক্ষ্যে। বছরের এ সময়টাতে ঝড় আর শিলাবৃষ্টি
হওয়ার কথা। কিন্তু শর্মিষ্ঠার মনে তখন হৃৎস্পন্দনের আচ্ছন্নতা। বোবা-
ধরা গলায় সে চেষ্টা করে ডাকার চেষ্টা করছিল ওদের। অন্ধকারে পথ খুঁজে
পাচ্ছিল না। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে সে হুগু হুচ্ছিল।

তারপর বিছাত ঝিলিক দিল ফের। মেঘের ডাকে বাড়ি কেঁপে
উঠল। সেই চকিত আলোয় শর্মিষ্ঠা যে দরজাটা দেখতে পেয়েছিল,
আন্দাজ করে সেদিকে এগিয়ে গেল। এমনি করে একঘর থেকে আরেক

ঘরে ঢুকল। কিন্তু হলঘরটা কোনদিকে বুঝতে পারল না। ও ঘরে উজ্জল আলো থাকার কথা।

আবার পা বাড়াল শর্মিষ্ঠা। এ ঘরে বড় ঢুকছে না। হয়তো একেবারে বাড়ির মাঝখানের ঘর। বিছাতের বিলিকও আসছে না। অন্ধের মতো হেঁটে শর্মিষ্ঠা কোথায় চলেছে, ঠাহর করতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে আচমকা সে কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তার ওপর পড়ে গেল। অফুট স্বরে কে কে বলে উঠল শর্মিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে এক বলক টর্চ জ্বলেই নিভে গেল।

কৃত্তিবাস ফিসফিস করে বলে উঠল, চুপ। আমি কৃত্তিবাস।...

রাতের কালবোশেখী হলঘরের বড় বড় দরজাজানালা খোলা পেয়ে তুলকালাম বাধিয়েছে ততক্ষণে। প্রথম ধাক্কাতেই পেট্রোম্যাক্স বাতিটা গেছে নিভে। জ্বালানোর চেষ্টা করেও কিছু হয় নি। তখন যোগেশ্বর পাম্প খুলে দিয়েছেন। উনুন থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার উড়তে শুরু করেছিল বলে জল ঢেলে নেভানো হয়েছে। মুখঢাকা প্র্যাপ্টিকের মস্তো বাজতিতে অনেকটা জ্বল ছিল। খাবার সময় টানাটানি পড়তে পারে।

ঘরে এখন অন্ধকার। সে অন্ধকার চিড় খাচ্ছে মুহূর্মুহ বিছাতের বিলিকে। চোখ খোলা য়র না ধুলোবালির উপজবে। তার সঙ্গে সেই সময় ~~কৃত্তিবাস~~ ~~অন্ধকার~~। শর্মিষ্ঠাকে ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া ~~হয় নি~~। কিন্তু সঙ্গে আর টর্চ নেই। অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে ~~কৃত্তিবাস~~। যোগেশ্বরের সাড়াশব্দ নেই। মিলন ও জলি গা ঘেঁষে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে।

তারপর বৃষ্টির ছাঁট হলঘরে ঢুকতে লাগল। মেঘগর্জনের সঙ্গে শুরু হয়েছে জোরালো বৃষ্টি। বাইরের জঙ্গল থেকে ছেঁড়াপাতা আস্ত ডালশুক এসে ছিটকে ঘরে ঢুকছে। নন্দন কানন থরথর করে কাঁপছে প্রকৃতির হঠকারী উপজবে।

কতক্ষণ পরে ঝড়টা কমে গেল। তারপর বৃষ্টিটাও ধরে এল। তখন যোগেশ্বর বললেন, মিলু, আলোটা খুঁজে নিয়ে এস। তুমি

আলাতে পারবে না, আমাকে দিও। চেষ্টা করে দেখব'খন। মনে হচ্ছে, বুষ্টির জল ঢুকে ম্যাটেলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

মিলন দেশলাই হাতড়াচ্ছিল। বলল, কী মুশকিল। দেশলাইটা কোথায় গেল ?

জলি বলল, পেট্রোম্যাক্সের কাছেই পড়ে আছে হয়তো।

বাস্! তাহলে আর আলো জ্বলবার আশা নেই। ভিজ়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বলে মিলন অন্ধকারে কতকটা হামাগুড়ি দিয়ে এগোল।...

একটা জানালা ইট সাজিয়ে কেউ অনেকটা ঢেকে রেখেছে। জানলার চৌকাঠ বাদে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সেই ইটের কাঁকে কুত্তিবাস ও শর্মিষ্ঠা চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরের ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আলো খুব কম। কারণ লণ্ঠনের কাঁচে ঘন কালি জমেছে।

কিন্তু আলো যত কম হোক, ভেতরের ব্যাপারটা দেখতে এবং বুঝতে অনুবিধে হচ্ছে না।

দুটি লোক মহানন্দে খেতে বসেছে এবং মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হাসছে। চাপা গলায় অল্পসল্প কথাবার্তাও বলছে।

খাচ্ছে খিচুড়ি এবং মাংসের ঝোল। থালা-টালার বালাই নেই। দুটি এনামেলের ডেকচি থেকে দুজনে তুলে তুলে খাচ্ছে।

একজন প্রোঢ়, অগ্ন্যজ্ঞান যুবক। দুজনের চেহারাই ভুতুড়ে। নোংরা। জলে ভেজা। কাদাও লেগেছে যথেষ্ট।

প্রোঢ় লোকটা বলল, ভুতো। কেমন খাচ্ছিস ?

দারুণ মামা। উকিল বাবুর মেয়ে খাসা রাঁধে।

ঝটপট খেয়ে নে। কাজে লাগতে হবে।

ও মামা! ওরা এতক্ষণ টের পেয়ে গেছে হয়তো।

কী রে ?

রাগা চুরি। বলে ভুতো খিক খিক করে হাসতে লাগল।

প্রোট লোকটাও অদ্ভুত হেসে বলল, টের পেলে কী হবে? ওরা
বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। বুঝলি?

কিন্তু ওরা তো পালিয়ে গেল না মামা?

পালাত। জলঝড় এসে গেল যে!

ঠিক বলেছ।...বলে ভূতো ঢেকুর তুলল। তার পেট ঢোল হয়ে
গেছে। সে একটা এনামেলের ঘটি থেকে জল খেতে লাগল।

মামা বলল, সবটা খাসনে। আর জল নেই। আমার জন্তো
রাখিস।

অনেক আছে, মামা।

শোন, হাপরে আগুন নিভে গেল নাকি ছাথ। বাকি মালগুলো
গলাতে হবে।

ভূতো হাপরে বাতাস ভরে আগুন চাঙ্গা করতে ব্যস্ত হল। ফৌস
ফৌস শব্দ হচ্ছিল হাপরে।

বোঝা যায়, খুব আয়োজন করে গেরস্থালি সাজানোর মত এঘরে
আড্ডা করেছে ওরা। আশেপাশে পড়ে রয়েছে কংকালগুলো। শর্মিষ্ঠা
দেখেই চিনেছে, যোগেশ্বরের সম্পত্তি সবই। এতক্ষণ হামলা করে
ফেলত। কৃত্তিবাস ওকে আটকে রেখেছে।

মামা ফের বলল, তবে মাঝখান থেকে একটা বন্দুক লাভ হয়ে গেল।

ভূতো বলল, একটা উর্চও! কিন্তু গুলি কোথায় পাবে মামা?

যোগাড় করে ফেলব দেখিস।...মামাচোর ঢকঢক করে জল খেল।
ফের বলল, জিনিসগুলো গলিয়ে বেচেখুচে দিয়ে অনেক টাকা পাব।
বুঝলি ভূতো? তারপর এখানেই স্থায়ী আস্তানা করব। নদীর চরে
হাঁস শিকার করব বন্দুকে। রাজার হালে থাকব দেখবি।

ভূতো বলল, কেউ যদি টের পায়, মামা?

কেউ টের পাবে না। যে এখানে আসবে, ভূতের ভয় দেখাব।
ব্যস।...মামাচোর সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসল। দেখলিনে অতগুলো
লোককে কেমন ভয় পাইয়ে দিলুম?

মামা হাপরের পাশে এসে বসল। হুঁ, আগুন হয়েছে। তবে

বুঝি ? আরও কাঠকয়লা যোগাড় করতে হবে । হাঃঘরে ওরা কাঠ
পুড়িয়েছে অনেক । সকালে নিয়ে আসব ।

হঠাৎ ভূতো ফিক করে হাসল । ও মামা ! একটা কথা ভাবছিলুম ।
কী রে ?

একখানা মোটরগাড়ি থাকলে খুব জমত ।

আছে তো ।

কেন, পুলিশবাবুর গাড়িটা । শেষ রাত্তিরে ওটা সারিয়ে ফেলব
বরং । তারপর জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রেখে আসব । গতক বুঝলে
এই গাড়িতে চেপে হাওয়া হয়ে যাব । প্যালানটা (প্ল্যান) কেমন
বলদিকি ভূতো ?

দারুণ মামা, দারুণ ! ভাগ্যিস তুমি মেকানিকস হতে পেরেছিলে !

মাথায় অনেক রকম প্যালান আসছে, বুঝি বাবা ? কোনটা
কাজে লাগবে, বুঝতে পারছিনে । কই, রেকাবগুলো এগিয়ে দে ।...

ঠিক এই সময় কুন্তিবাস এক লাফে এগিয়ে গেল দরজার দিকে ।
শর্মিষ্ঠাও অনুসরণ করল । ওপাশের দরজায় গিয়ে কুন্তিবাস একটু হেসে
বলে উঠল, বন্ধুমামা, কেমন আছে ?

মামাচোর বন্ধুবিহারী ছোট-ছোট চোখে নিষ্পলক তাকাল । পাথরের
মূর্তি যেন । ভূতো যে রে ! খবর কী ? কুন্তিবাস ভূতোর দিকে পা
বাড়াল ।

ভূতো ছিটকে সরে গেল । তারপর ওদিকের জানালায় রাখা ইট-
গুলোতে একরকম চুঁ মেরে চলে গেল ওপারে । ইটগুলো গড়িয়ে পড়ল
ছুন্নাড় শব্দে । তার মাথাও হয়তো কাটল ।

বন্ধুবিহারীর সম্মুখে জাগতেই বন্দুকের দিকে হাত বাড়িয়েছে ।
শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বলল, ওতে গুলি নেই ।

অমনি বন্ধু হেরিকেনটা নিভিয়ে দিল । তারপর অন্ধকারে শর্মিষ্ঠা
ও কুন্তিবাসের মাঝখান দিয়ে গুলতির মত বেরিয়ে গেল ।

কুন্তিবাস টর্চ জ্বলে আর তাকে দেখতে পেল না ।

কিছুক্ষণ পরে।

পেট্রোম্যাক্স বাতিটা অনেক চেষ্টায় জ্বলেছে। সেই বাতির উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে যোগেশ্বর তাঁর চুরি যাওয়া জিনিসগুলো দেখছিলেন।

জলি ও শর্মিষ্ঠা চোরের আস্তানা এই প্রথম দেখেছে। তারা ভারি অবাক হয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে। ময়লা হেরিকেন, মিস্তিরিদের টুকিটাকি যন্ত্রপাতি, হাপর এইসব। খিকনিকের রান্নাটা বরবাদ। চোরদ্বয় ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিল, ডেকচি ছুটো চৌছেমুছে সাবাড় করেছে।

ওদিকে কুন্ডিবাস আর মিলন গেছে গাড়িটা চোরেরা নিয়ে গেছে নাকি দেখতে বন্ধুবিহারী পাকা মিস্তিরি। সুতরাং সে আশঙ্কা ছিল।

এক সময় ওরা ফিরে এসে জানাল, গাড়িটা সেখানেই আছে। এখন বড় জলকাদা ওখানে। গাড়ি উদ্ধার করার সমস্যা হবে।

যোগেশ্বর বললেন, সকাল হতে দাও। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর ওই ব্যাটা বন্ধু আর তার ভাগ্নে ছোকরারও সদগতি করে ফেলব। বাঘের ঘরে ঘোগ—সর্বের মধ্যে ছুত ঢুকেছিল। কী সম্পর্ক ব্যাটা-ছেলেদের!

শর্মিষ্ঠা বলল, কিন্তু এভাবে রাত কাটাও নাকি আমরা?

কুন্ডিবাস বলল, ন মাইল রাস্তা হাঁটতে পারবেন না। বরং ঝলঘর থেকে শতরঞ্জি আর সব জিনিসপত্র এখানে বয়ে নিয়ে আসি। এখানেই শুয়ে পড়া যাবে। আসুন, মিলনবাবু!

যোগেশ্বর তাঁর অপহৃত তাম্রফলকটা তুলে দেখতে দেখতে বললেন, আহা! বড় আনন্দ হচ্ছে। বড় আনন্দ হচ্ছে। বাকি রাত আমরা গান গেয়েই কাটাও ...
